সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

কোনও রাজনৈতিক দলেরই ভাবমূর্তি এখন উজ্জ্বল নয় □ ৯

তৃণমূলী রাজনীতির কানাগলিতে পশ্চিমবঙ্গ □ ১০

খোলা চিঠি : মমতা, অমিতাভ, সোনিয়া, শাহরুখ ও এফ ডি আই □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

খুচরো বাজারে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশ : এক সর্বনাশাকে নিমন্ত্রণ □ দেবব্রত চৌধুরী □ ১২

মহতী মাহাত্ম্যে মহালয়া □ সংকর্ষণ মাইতি □ ১৪

পৌরাণিক নগর কেকয় □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২১

দুর্গাপূজায় শস্য আরাধনা □ মেঘদূত ভুঁই □ ২২

জুতা মেরেছে, কিন্তু অপমান করেনি! □ শিবাজী গুপ্ত □ ২৭

রাজনৈতিক মানসিকতার খোলনলচে পাল্টাতে হবে □ এম ভি কামাথ □ ২৮

অসম : মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরাই এখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক □ তারক সাহা □ ৩০

সুদর্শনজী : কিছু স্মৃতি □ প্রদীপ ঘোষ □ ৩২

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা হলেন শান্তা আক্কা □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মহতী মাহাত্ম্যে মহালয়া
পৃঃ ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা, ২১ আশ্বিন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ৮ অক্টোবর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : মল্লভূমের রাজবাড়ির দুর্গোৎসব

রাজা যখন নেই, তখন রাজত্বের গরিমাও যে অস্তমিত হবে তাতে আর আশ্চর্যের কী! তবে আমাদের জাতীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে সেই অস্তমিত গরিমা যেন ফিনিক্স পাখির মতোই মনে করিয়ে দিয়ে যায় বাঙালি-র সমৃদ্ধ অতীতের গৌরব। মল্লভূমি বলে পরিচিত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আজ যখন 'জঙ্গলমহল' নামক ভয়াবহ আতঙ্কের ঘেরাটোপে বন্দী, তখন অতীতকে ফিরে দেখলাম আমরা। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সেখানকার রাজপরিবারের উৎসবের আমেজ তুলে ধরছেন— বাণীব্রত মিত্র, নবকুমার ভট্টাচার্য ও অর্ণব নাগ।

এছাড়া অন্যান্য বিষয় তো থাকছেই।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

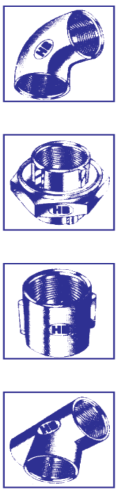

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

কর্পোরেট দানব

দেবী দুর্গার সহিত মহিষাসুর আসিবার পূর্বেই কর্পোরেট দানবের আবির্ভাব ঘটিতেছে। সরকারি অনুমোদন প্রক্রিয়া পর্ব মিটিলেই ভারতের বাজারে এই কর্পোরেট দানবের অবির্ভাব ঘটিবে। বিশ্বের রিটেল চেন মার্কেটে বিত্তবান সংস্থা 'ওয়ালমার্ট' কর্পোরেট দানব নামেই খ্যাত। যে দেশে গিয়াছে সেই দেশের দেশীয় পুঁজির সংস্থাগুলিকে গলাধঃকরণ করিয়াছে। 'ওয়ালমার্ট' নামক এই কর্পোরেট দানবটি আসলে কে? ১৯৬২ সালে মার্কিন মুলুকে স্যাম ওয়ালটনের হাত ধরিয়া বিশ্বের রিটেল চেন মার্কেটে আসিয়াছিল ওয়ালমার্ট। সম্বল ছিল কম দামে গ্রাহকদের হাতে নানা দ্রব্য তুলিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি। ইহার পর ৬১ বছর ধরিয়া বিশ্বের মোট ১৬টি দেশে ব্যবসার প্রসার ঘটাইয়াছে মার্কিন মুলুকের এই সংস্থাটি। আজ ইহার ছোট বড় আকারের বিপণি সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৯৭০টি। ২০১১-১২ আর্থিক বৎসরে এই সংস্থার মোট ব্যবসার পরিমাণ ৪৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিশাল বাণিজ্যের কারণেই এই সংস্থা বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এহেন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের বাজারে প্রবেশ করাইতে গিয়া আর্থিক সংস্কারের পক্ষেই বারে বারে সওয়াল করিতেছেন মনমোহন সিং। ওয়ালমার্টকে ভারতের বাজারে প্রবেশের অনুমতি দিতে তাঁহার এত আগ্রহ কেন? রহস্য রহিয়াছে এইখানেই। আর এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, 'সংস্কারের নামে আমআদমির জন্য কর্তব্যের দোহাই পাড়িয়া লুঠ চলিতেছে।' বস্তুত আমাদের দেশে খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগের খুব একটা প্রয়োজন রহিয়াছে কি? এরাজ্যেই বহু আদর্শ সমবায় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে, যাহারা আমানত সংগ্রহ করিয়া ঋণ দানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সজীব রাখিয়াছে এবং এই কাজে কৃষিসমবায় ঋণদান সমিতিগুলির ভূমিকা প্রশংসনীয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহারাই প্রকৃত খুচরো ব্যবসায়ীদের মূলধন যোগাইতে পারিবে। এছাড়া রহিয়াছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিও। এই ওয়ালমার্ট সংস্থা দেশের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কি স্বার্থরক্ষা করিতে পারিবে? ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে উত্তর মিলিবে।

২০১১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে কৃষকদের বিক্ষোভের মুখে পড়িয়াছিল 'ওয়ালমার্ট'। কারণ সংস্থাটি সেই দেশে ব্যবসা শুরু করিয়া নিজেদের বাঁধিয়া দেওয়া মূল্যেই কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এতেই কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া ওঠে। তাই তাহারা একযোগে বিক্ষোভে সামিল হয়। একই চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে দক্ষিণ কোরিয়া হইতেও। সেখানেও কৃষকরা বাধ্য হইয়াছিলেন কমদামে ওয়ালমার্টের মতো সংস্থাকে তাহাদের ফসল বিক্রি করিতে। ফলস্বরূপ বিদ্রোহ। এই কৃষক আন্দোলন এতটাই তীব্র ছিল যে সেখানকার সরকার বাধ্য হয় ওয়ালমার্টকে জরিমানা করিতে। সমীক্ষা বলিতেছে, কৃষকদের কমদামে ফসল বিক্রি করিতে বাধ্য করে ওয়ালমার্ট কর্তৃপক্ষ। এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক বরিষ্ঠ মার্কেটিং আধিকারিক প্রফেসর আন্ড্রু শেফার্ডের গবেষণায়। শেফার্ডের গবেষণা বলিতেছে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার মতো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কৃষকেরা ওয়ালমার্টের চাপে পড়িয়া কম দামে ফসল বিক্রি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি এই চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক কৃষক আত্মহত্যার পথ বাছিয়া লইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার তাঁতি, পানচাষি, মাদুরচাষী, ফুলচাষী থেকে শুরু করিয়া ৪৫ লক্ষ বিড়ি শিল্পের শ্রমিক ও কারবারিরা কি এইবার বহুজাতিক কোম্পানী ওয়ালমার্টের কাছে বন্ধক হইয়া যাইবেন। আমআদমির স্বার্থে একদিন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, কয়লাখনি রাষ্ট্রীয়করণ হইয়াছিল। আজ বিদেশি বিনিয়োগকারিদের স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া ভারতীয় আইন ও সংবিধানকে মার্কিনিকরণ করিতে চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত খুচরো ব্যবসায় দেশীয় বৃহৎ পুঁজির যে লগ্নি হইয়াছে তাহার ফলাফলটাও লক্ষণীয়। এখনও পর্যন্ত কোনও বড়সড় পরিকাঠামোগত বিনিয়োগ হয়নি, শুধুমাত্র সংগ্রহ কেন্দ্র গড়িয়া পণ্যাদি মজুদ হইয়াছে মাত্র। দেশীয় কর্পোরেট দানবদেরও মূল উদ্দেশ্য হইল বাজার দখল করা। কোনও স্তরে কোনও গুণমান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া নয়। এখনও পর্যন্ত পণ্য সংগ্রহের ৭০ শতাংশ পাইকারি বাজার থেকে সংগ্রহ করা হইয়াছে, সরাসরি কৃষকের থেকে নয়। দেখা যাইতেছে দেশীয় কর্পোরেট দানবের অনুপ্রবেশের ফলেই বেঙ্গালুরু, চণ্ডীগড়, আমেদাবাদ, জয়পুর, কানপুরের ছোট খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রিবাটা ৩০ শতাংশ কমিয়া গিয়াছে। এখন বিশ্বের তাবড় কর্পোরেট দানবেরা প্রবেশ করিলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

এই ভারতেই মানুষ যখন জগৎকে মনের কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস করে এবং চিন্তা করে, তাহা যে সত্য, ইহা প্রমাণ কবিরার জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ, বিষয়-সম্পত্তি সকলই সে ত্যাগ করিয়া থাকে। মানবজীবনটা দু-দিনের নয়, প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবন অনাদি অনন্ত—এ কথা যখনই কেহ বুঝিতে পারে, তখন এই ভারতেই মানুষ নদীতীরে বসিয়া অনায়াসে শরীরটা পরিত্যাগ করিতে পারে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

মালদার কালিয়াচক জাল নোট চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য : বি এস এফ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মালদা জেলার কালিয়াচক জাল নোটের চোরাকারবারের মূল ঘাঁটি হয়ে উঠেছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বি এস এফ)-এর অ্যাডিসনাল ডাইরেক্টর জেনারেল (পূর্ব) বি ডি শর্মা গত ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি আরও বলেন, চোরাকারবারীরা এখন এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে জাল নোট পাচারে সেচ দপ্তরের জলের পাইপকে কাজে লাগাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, সম্প্রতি ঢাকায় বর্ডার রুখতে দু'দেশই একটি টাস্কফোর্স গঠন করতে রাজি হয়েছে। উল্লেখ্য, কালিয়াচক যে জাল-নোট চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য— এই মর্মে স্বস্তিকা-য় ইতিপূর্বেই খবর প্রকাশিত হয়েছে। বি এস এফ-এখন তা স্বীকার করেছে।

আরও একটা কৌতূহলের বিষয় হলো, গোরু চোরা-পাচারকারীদের সঙ্গে জাল নোটের পাচারকারীদের ভেতর ভেতর একটা বোঝাপড়া আছে। বিশাল অঙ্কের জাল নোটকেই তারা নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে শ্রীশর্মা বলেন, মনে করুন একটা গোরুর দাম ১ হাজার টাকা। কিন্তু জাল নোটের ক্ষেত্রে বর্ডারের ওপারে এর দাম হবে প্রায় ১৫০০ টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১২-তে এখন পর্যন্ত ১৯.৮৩ লাখ টাকা মূল্যের জাল নোট আটক করা হয়েছে। ২০১১ সালে আটক জাল নোটের মূল্য ছিল ৪৩.৮১ লাখ টাকা।

এবছর এখনও পর্যন্ত জাল নোট কারবারে ৪৪ জন ভারতীয় এবং ১৩ জন বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বি এস এফ-এর ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি

আগস্ট	আহত	নিহত
২০১২	৯৮	১
২০১১	১৪৭	—
২০১০	৫৭	—

কোনও উপায় না থাকলে গুলি চালানোর নীতি অপরাধীদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং রাতের অন্ধকারে জওয়ানদের প্রায় কোণঠাসা করে সীমান্ত বরাবর অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।
অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল (ইস্ট), বি এস এফ

বি এস এফ-এর গুলি চালনায় নিহতের সংখ্যা কমেছে

আগস্ট	মৃত্যু
২০১২	১৬
২০১১	১৭
২০১০	৯৩

সীমান্তরক্ষার জন্য সীমান্ত পরিচালন ব্যবস্থা ঠিক করছি। আমরা থামব গ্রেনেডস, ইল্যুমিনেশন বোম্ব ও পাম্প অ্যাকশান গানস ব্যবহার করছি যা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ব্যাপক সাহায্য করেছে।
বি ডি শর্মা, এ ডি জি, বি এস এফ

ছত্তিশগড়ের ৬ হাজার বর্গ কিমি এখনও মাওবাদী খপ্পরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্য আসছে ধীরগতিতে। সম্প্রতি একথা জানালেন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বলের (সি আর পি এফ) বিদায়ী অধিকর্তা কে. বিজয় কুমার। এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন যে, গত দু'বছর নিরাপত্তারক্ষীরা দেশের ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা মাওবাদী কবল থেকে মুক্ত করেছে। যদিও এখনও ৬ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা মাওবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করা যায়নি।

এই সব এলাকাগুলি ছড়িয়ে রয়েছে অধিকাংশ ছত্তিশগড় ও তৎসংলগ্ন ওড়িষা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।

তিনি আরও বলেন, "ধীরে অথচ ক্রমাগত আমরা ওইসব অঞ্চলে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছি যা আগে মাওবাদীদের অধ্যুষিত অঞ্চল বলে গণ্য হোত। উদাহরণ হিসেবে ঝাড়খণ্ডের সানন্দা-র কথা বলা যায় যেখানে আমাদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্য এসেছে ওড়িষা এবং বিহারের কিছু এলাকাতেও। আমরা ক্রমান্বয়ে এইসব মুক্ত অঞ্চলগুলি শীঘ্রই স্থানীয় প্রশাসনের হাতে প্রত্যর্পণ করব যাতে উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হয়।"

"এখন সবচেয়ে বড় অঞ্চল হলো ছত্তিশগড়ের আবুঝমাড় এলাকা, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম ছত্তিশগড়, তার আশপাশ অঞ্চল যেমন মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি জেলা এবং ওড়িশার মালকানগিরি অঞ্চল যা মাওবাদী নিয়ন্ত্রিত ভয়ানক উপদ্রুত অঞ্চল। তিনি আরও বলেন, ৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার উপদ্রুত অঞ্চল এখন পুরোপুরি নিরাপত্তাকর্মীদের করায়ত্ত।

এই বছর মার্চের গোড়ায় অবুঝমাড় অঞ্চলে যে অভিযান চালায় সুরক্ষা বল তা শ্রীকুমারের কথানুযায়ী এক বড়সড় অভিযান। সেই ১৯৮৮ সাল থেকে এইসব অঞ্চলের লোকজন মাওবাদীদের অধীনস্থ। প্রায় ২৫ বছর ধরে এরা জানে না সরকার নামক বস্তুটি আসলে কী। এজন্য কেউ হয়ত দোষী নয়, তবুও এখন আমাদের সরকারি আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাঁর আরও দাবি মাওবাদী প্রভাব ক্রমাগত কমে আসছে।

কুমার আরও বলেন যে, চিরুনি অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই সরকারকে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে জোরকদমে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মসূচীও পালন করতে হবে। তাঁর অভিমত, এই ত্রিমুখী অভিযান অবশ্যই সমানভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে বিপাকে গেহলট সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাজস্থান সরকারের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে আসা একটি সার্কুলারে বলা হয়েছিল, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে রাজস্থানে শুরু হতে চলা তিনদিনের আর এস এসের চিন্তন শিবিরে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান নিষিদ্ধ। সরকারের এই সার্কুলার প্রকাশ্যে আসার পর বিক্ষোভের ঝড় ওঠে গোটা দেশ জুড়ে। প্রবল বিক্ষোভের মুখে নিজেদের ফেলা থুতু নিজেদেরই চাটতে হয় রাজস্থানের কংগ্রেসী সরকারকে। সার্কুলার প্রকাশ্যে আসার পরদিনই অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর নিজের সার্কুলারের বিরুদ্ধেই এফ আই আর করতে হয় গেহলট সরকারকে। আর এস এসের যে মেগা চিন্তন শিবিরকে ঘিরে এত কাণ্ড তা শুরু হয়েছে গত ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য রাজধানী জয়পুরের পার্শ্ববর্তী জামদোলি-তে। প্রায় ৮০০০ স্বয়ংসেবক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই শিবিরে যোগদান করেন। সাম্প্রতিক অতীতে একে রাজস্থানে আর এস এসের সর্ববৃহৎ শিবির বলে মন্তব্য করেছে সংবাদমাধ্যম। শিবির উদ্বোধন করেন স্বয়ং আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত।

স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য সরকার সঙ্ঘের এই আয়োজন সম্পর্কে অবহিত ছিলই। প্রবল চাপের মুখে ওই কালা-সার্কুলারটিকে 'জাল' বললেও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশেই তা জারি করা হয়েছিল বলে সরকারেরই একাংশ মনে করছেন। কারণ সার্কুলারটি জারি হবার পরই তা সাংবিধানিক অধিকার ভঙ্গের দায়ে পড়েছিল। রাজস্থান অ্যাডভোকেট কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক বসন্ত ছাবা প্রশ্ন তুলেছিলেন, "এই সার্কুলারটি সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপন্থী। যে আদেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক সংগঠনের, যার মধ্যে আর এস এসও রয়েছে, কাজে যোগদানে বাধা দেওয়া চলবে না।"

সরকারের তরফ থেকে প্রথমে বলার চেষ্টা হয়েছিল মুখ্যসচিবের অজ্ঞাতসারে পার্সোনেল দপ্তর এই সার্কুলার জারি করেছে। কিন্তু এতেও মুখরক্ষা হচ্ছে না বুঝে সরকারের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে বলা হয় যে এরকম কোনও সার্কুলার-ই নাকি সরকারি তরফ থেকে ঘোষিত হয়নি এবং এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে যে সার্কুলারের কপি পাঠানো হয়েছে, তাও নাকি জাল। সরকারি আধিকারিকদের দাবি— কিছু 'রহস্যময় বস্তু'র হাতের কারসাজি এই সার্কুলার। তদন্তের ভার আপাতত পুলিশের ওপরই বর্তেছে।

অশোক গেহলট

সরকারের ভাব-মূর্তি খারাপ করতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই সার্কুলার বাজারে ছাড়া হয়েছে বলে দাবি করা হলেও সরকারে অসদুদ্দেশ্য কিন্তু চাপা থাকছে না। গত ২৪ সেপ্টেম্বর জয়পুরের প্রথম সারির একাধিক সংবাদমাধ্যমের কাছে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট থেকে জারি করা ওই সার্কুলারের কপি পৌঁছে যায়, আরও একগুচ্ছ সরকারি প্রেস-বিজ্ঞপ্তির সঙ্গেই। পরেরদিন সকালে রাজ্যের সবকটি সংবাদপত্রে ওই একই সার্কুলারবার্তা পৌঁছয়। কলঙ্কিত সেই সার্কুলারটি জারির তারিখ হিসেবে উল্লিখিত রয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর, স্বাক্ষর রয়েছে পার্সোনেল দপ্তরের এক উপ-সচিবের। সাধারণভাবে সরকারের ডিরেক্টোরেট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস-এরই দায়িত্ব থাকে সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর। সুতরাং ওই কুখ্যাত সার্কুলারটির সঙ্গে আসা বাকি একগুচ্ছ প্রেস-বিজ্ঞপ্তি যদি সরকারের তরফ থেকেই পাঠানো হয়ে থাকে, তবে শুধুমাত্র একটি বিশেষ সার্কুলার তাদের পাঠানো নয়, সরকারের এই যুক্তি ধোপে টেকে না বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

'পাথেয় কোণ' পত্রিকার সম্পাদক কে এল চতুর্বেদী মনে করেন, "বিধানসভা নির্বাচন কাছে বলেই, মুসলিম ভোট-ব্যাঙ্কের লোভে সরকার এধরনের সার্কুলার জারি করতে সাহস পেয়েছে। যদিও এরকম আচরণ সরকারের নতুন নয়। দশ বছর পূর্বেও আর এস এস এবং তার সমমনস্ক সংগঠনগুলোর অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান নিষিদ্ধ করতে একইরকম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।"

সংশোধনী

(১) স্বস্তিকা'র গত ১ অক্টোবর সংখ্যায় ১৪ পৃষ্ঠায় রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ ২০০৭ সালের মার্চে নাগপুরে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভার বৈঠকের কথা উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ওই বৈঠকটি আয়োজিত হয় ২০০৯-এর মার্চে।

(২) ওই সংখ্যার ১৫ পৃষ্ঠায় ছবির ক্যাপসনে ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত যে কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে, আসলে তা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে।

(৩) ওই সংখ্যারই ১৬ পৃষ্ঠায় ছবির ক্যাপসনে সঙ্ঘের দুই প্রবীণ কার্যকর্তা কেশবরাও দীক্ষিত ও অমল কুমার বসু-কে যথাক্রমে প্রাক্তন ক্ষেত্রপ্রচারক ও প্রাক্তন ক্ষেত্রসঙ্ঘচালক হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে প্রাক্তন সহ-ক্ষেত্রপ্রচারক ও প্রাক্তন প্রান্ত সঙ্ঘচালক।

উপরোক্ত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আন্তরিক দুঃখিত। —***সঃ স্বঃ***

সংবাদ প্রতিবেদন

যুগল কিশোর জৈথলিয়ার ৭৫ বর্ষপূর্তিতে সংবর্ধনা

ব্যক্তি যুগলজীকে নয়, তাঁর আদর্শকেই অভিনন্দন : ড. যোশী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ৭৫তম পূর্তি জন্মবর্ষে অভিনন্দন ব্যক্তি যুগলজীকে নয়, তিনি যে আদর্শের ধারক, তাকেই অভিনন্দন। যুগলজী মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতির প্রতীক। তিনি প্রথম থেকেই বিজেপি-র সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কখনও বিধায়ক বা সাংসদ হওয়ার জন্য টিকিট চাননি। বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার-এর স্বপ্নকে স্বয়ংসেবক হিসেবে যুগলজী রূপ দিতে পেরেছেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিমল লাট, রাজস্থানের প্রাক্তন মন্ত্রী ইউনুস খান, বিশ্বম্ভর নেওর, রাহুল সিনহা, সজ্জন কুমার তুলসীয়ান প্রমুখ। মহোৎসব ড. মুরলীমনোহর যোশী। শ্রী যুগলজীর জীবন ও কর্ম এই গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়।

সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে শ্রীযুগলজী বলেন, যেসব গুণের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে তা তাঁর অর্জিত নয়— ঈশ্বরের দান। আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, সঙ্ঘের অধিকারী ভাণ্ডরলালজী

মঞ্চে সংবর্ধনার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন যুগলকিশোর জৈথলিয়া। বাঁ দিক থেকে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সজ্জন কুমার তুলসীয়ান, শার্দুল সিং জৈন, কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, মুরলী মনোহর যোশী, ইউনুস খান, বিমল লাট ও অন্যরা। ছবি : শিবু ঘোষ

রাজনীতি শব্দটির মধ্যে নীতি আছে। নীতি নৈতিকতার প্রতীক। যুগলজী নীতিবাদী। তিনি নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির পথিক। এক সংহত চরিত্রের মানুষ। গত ২ অক্টোবর কলকাতায় অসোয়াল ভবনে যুগল কিশোর জৈথলিয়ার অমৃত মহোৎসব অভিনন্দন উৎসবে এই কথাগুলি বলেন সাংসদ ও প্রাক্তন মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী ড. মুরলী মনোহর যোশী। শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় যুগল কিশোর জৈথলিয়ার ৭৫তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অমৃত মহোৎসব অভিনন্দন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিনের এই সংবর্ধনাকে ঘিরে আনন্দ-উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রসঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল সমিতির অধ্যক্ষ শার্দুল সিং জৈন উৎসবের সূচনায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে শ্রী জৈথলিয়ার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেন। ভারত বন্দনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। যুগলজীকে তিলক পরিয়ে ও মঙ্গল আরতির মাধ্যমে বরণ করে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে মালা,নারিকেল ও শাল দিয়ে বরণ করেন মঞ্চস্থ গুণীজনরা। ডঃ মুরলীমনোহর যোশী যুগলজীর হাতে মানপত্র তুলে দেন। স্বস্তিকা পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে শাল, মালা ও পাঁচ ফল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এদিন যুগলজীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মহাবীর বাজাজ সম্পাদিত 'কর্মযোগ কা পথিক' গ্রন্থটির লোকার্পণ করেন মল্লাবত এবং রাধাকৃষ্ণ নেওটিয়াজি তাঁর জীবনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছেন বলে তিনি জানান। আরও অধিক কাজ করার জন্য তিনি সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক কৃষ্ণ বিহারী মিশ্র যুগলজীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কথা জানিয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শে চালিত এক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁকে তুলে ধরেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠি। শেষ ধন্যবাদ জানান রূপলাল সুরানা জৈন। এরপর সকলকে সহভোজে আপ্যায়িত করা হয়। প্রীতি উপহার হিসাবে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'কর্মযোগ কা পথিক' গ্রন্থটি। সব মিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান ছিল মূল্যবোধভিত্তিক জীবনের জয়গান।

কোনও রাজনৈতিক দলেরই ভাবমূর্তি এখন উজ্জ্বল নয়

দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতির নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করলে একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আসন্ন। সেই পরিবর্তন ভাল না মন্দ হবে সে কথা এখনই বলা যাবে না। খোলা মনে, খোলা চোখে যদি একবার দেশের সমস্ত ছোট বড় রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপের পর্যালোচনা করেন তবে দেখবেন কোনও একটি দলেরও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা কম-বেশি আর্থিক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত। হয়তো দু' একজন নেতা আছেন যাঁরা সৎ এবং দুর্নীতিমুক্ত। কিন্তু এক ঝুড়ি পচা আলুর ভিতর থেকে দু'চারটি ভাল আলু খুঁজে বার করা অসাধ্য কাজ। তবু খুঁজে পেলেও সেই আলুর বিশুদ্ধ চরিত্রকে বিশ্বাস করবে না কেউ। যেমন, মহারাষ্ট্রের আন্না হাজারে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই শুরু করেছিলেন। সেই লড়াইকে সারা দেশের আমজনতা স্বাগত জানিয়েছিলেন। সকলেই বিশ্বাস করেছিলেন আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগুন অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে সারা ভারতে। একদা পাটনার আশ্রমে অবসররত সোস্যালিস্ট নেতা প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণ রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ের আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল দেশজুড়ে। পরিণামে কেন্দ্রে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন ইন্দিরা এবং তাঁর দল কংগ্রেস। আন্না হাজারে এবং তাঁর সহযোদ্ধারা দুর্নীতি বিরোধী লড়াইকে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনের চেহারা দিতে পারেননি। উল্টে আন্নার টিমের কয়েকজনের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছেন। আন্দোলন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। যেমন, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ক্ষমতায় থাকার সুবাদে লুঠ করেছে সেই ব্যাপারে দেশের মানুষের কোনও সন্দেহ নেই। কংগ্রেসকে কেন্দ্রে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে সে ব্যাপারেও কোনও দ্বিমত নেই। তবে কংগ্রেসকে সরিয়ে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের জোটকে ক্ষমতার গদিতে বসানো হবে তা নিয়ে জনমানসে বিস্তর বিভ্রান্তি আছে। এই বিভ্রান্তির কারণ একটাই। সাধারণ মানুষের কাছে দেশের কোনও রাজনৈতিক দলেরই ভাবমূর্তি এখন উজ্জ্বল নয়। একদা কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে সততার প্রতিমূর্তি রূপে প্রচার করা হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে তাঁর ব্যক্তিগত

গূঢ়পুরুষের

কলম

সম্পত্তির মূল্য ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এই বিপুল সম্পদ তিনি কীভাবে অর্জন করেছেন তার কোনও ব্যাখ্যা প্রধানমন্ত্রী দেননি। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য প্রফুল্ল পটেল লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর সম্পত্তির মোট মূল্য হচ্ছে ৫২ কোটি টাকা। শরদ পাওয়ারের নিজস্ব সম্পত্তি আছে ২২ কোটি টাকা। কপিল সিবলের সম্পত্তির মূল্য ৪৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের ছোট বড় মেজ সব মন্ত্রীরাই গত তিন বছরে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। সকলেই কমপক্ষে ২০-২২ কোটি টাকা কামিয়ে নিয়েছেন। কীভাবে মাত্র দুই তিন বছরে গড়ে ২০-২২ কোটি টাকা রোজগার করা যায় তার ব্যাখ্যা না দিলেও চলে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও তাই তাঁদের বিপুল উপার্জনের কোনও ব্যাখ্যাই দেননি। শুধু খারাপ লাগে যখন তাঁরা দেশের মানুষকে উপদেশ দেন কৃচ্ছসাধনের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আম জনতার জন্য পরিবার পিছু বছরে চারটি থেকে ছয়টি রান্নার গ্যাস হলেই চলবে। মন্ত্রীদের এবং সাংসদদের জন্য বছরে ২৪টি গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তুকিতে দেওয়া হবে। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেন মন্ত্রী- সাংসদরাও কৃচ্ছ্রসাধন করবেন না সে প্রশ্ন করা যাবে না। করলে জঙ্গি দমন আইনে জেলে পোরা হবে।

প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণ ইন্দিরা কংগ্রেসের রাজনৈতিক দুর্নীতির প্রতিবাদী আন্দোলনে দেশের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করেছিলেন। কারণ, মানুষ তাঁর সততার উপর আস্থা রেখেছিল। এখন সেই আস্থা বিশ্বাসই প্রশ্ন চিহ্ন তুলেছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ মমতার পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। বিশ্বাস করেছিল দলদাস কম্যুনিস্টদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেবেন। রাজ্যের মানুষের সেই আস্থা বিশ্বাস কী এখনও তেমনি আছে? দয়া করে নিজেকে এই প্রশ্নটি করুন।

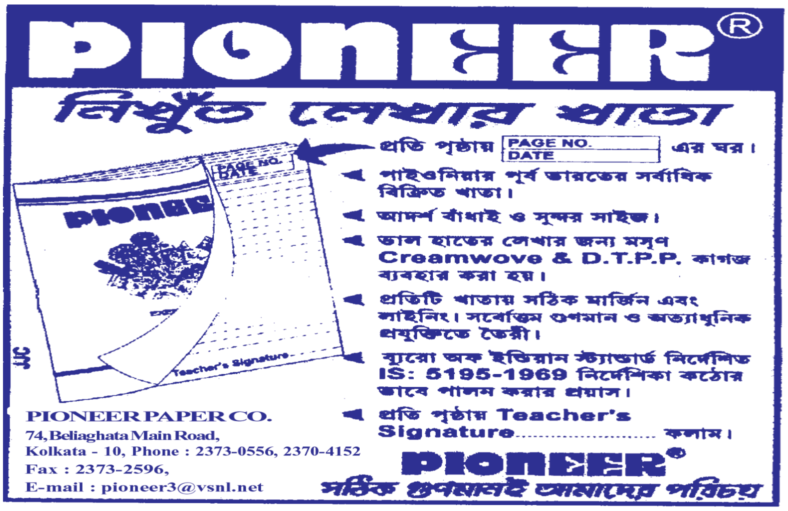

তৃণমূলী রাজনীতির কানাগলিতে পশ্চিমবঙ্গ

নিশাকর সোম

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে দু'টি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। একটি হলো সিপিএমের উত্থানের প্রয়াস। যার প্রতিফলন হলো পার্টির উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ডাকে ১ অক্টোবরের সমাবেশ। ১ অক্টোবর, ১৯৪৯-এ চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করে কমিউনিস্ট রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন-কে দেখা যায়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সান-ইয়াৎ-সেন-এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার স্লোগান দিয়েই চীনের জনগণকে তাঁদের পাশে এনেছিলেন। তাঁরা মার্কস এঙ্গেলস-এর বুলি জনগণের কাছে আওড়াননি। চীন দেখিয়েছিল যুক্তফ্রন্ট কাকে বলে— কুওমিংটান-এর একটি অংশের প্রতিনিধি চীনের সরকারে ছিলেন। পাঠক হয়তো মনে করছেন ধান ভাঙতে শিবের গীতের কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এজন্য যে সিপিএম-তো চীনের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নীতি অনুকরণ করে পার্টি ভাগ করেছিল। আবার 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে নকশাল থেকে আজকের মাওবাদীদের সৃষ্টি।

এদেশে কমিউনিস্ট নামধারীরা বস্তুত দেশের ঐতিহ্য ভুলে, অন্ধভাবে বিদেশি-নীতি কপচায়। তার ফলে আজ ক্রমশ ভারতে তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

যে অহংকারের ফলে সিপিএমের পতন হয়েছে তা এরাজ্যের ক্ষমতাহীন নেত্রীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বিপুল জনসমর্থনের ফলে আত্মসন্তোষ, তা থেকে আত্মশ্লাঘা এবং পরে অভ্রংলেহি মনোভাব।

এ রাজ্যে সরকারে আসার পর থেকেই নেত্রীর বিভিন্ন বিষয়ে মন্তব্যের ফলে তাঁরই অনুসারি জনগণ, যাঁরা সিপিএমের রাজত্বের অবসান চেয়েছিলেন তাঁরা ক্রমশ হতবাক হচ্ছেন! ছাত্র-যুব শ্রমিক- কর্মচারীদের মধ্যে নেত্রী নিজস্বগোষ্ঠী গড়ে তুলছেন। তা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে এক সময় ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্টের নেতা শোভনদেবকে সরিয়ে পূর্ণেন্দু বোস, দোলা সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এখন আবার তাঁদের সরিয়ে সুব্রত মুখার্জিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুব্রত মুখার্জি তো প্রায় উপমুখ্যমন্ত্রীর মতো হাবভাব-এ চলছেন!

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তথা ইউপিএ-২ সরকার এফ ডি আই সমেত কয়েকটি আর্থিক ব্যবস্থা ঘোষণা করার পর দেশের বৃহত্তম বিরোধীদল বিজেপি ভারত বন্ধ-এর ডাক দেয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দল এই বন্ধকে সমর্থন জানায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট বারো ঘণ্টার বন্ধ-এর আহ্বান জানায়। এই বন্ধকে ব্যর্থ করার জন্য বাস-মালিকদের ভাড়া বাড়ানোর টোপ দেখিয়ে বন্ধের দিনেই বাস চালানোর ব্যবস্থা করা হয়। তৃণমূল নেত্রী বন্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, 'আমি তো প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু বন্ধ চল্‌বে না।' পরে তৃণমূল নেত্রী মনমোহন সিং-সোনিয়া গান্ধীর কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার

আশায় এক ঘণ্টার সভাকে সাড়ে চার ঘণ্টার পরিণত করেও কোনও ফসল তুলতে ব্যর্থ হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তৃণমূল মন্ত্রীদের পদত্যাগ করিয়ে এবং ইউপিএ-২ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। তারপর থেকেই নেত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। যে সব বিষয় নিয়ে তিনি সমালোচনা করেন অতীতে সেইগুলিকে তিনি সমর্থন জানিয়েই রেলমন্ত্রী ছিলেন এবং ইউপিএ-২ সরকারে তৃণমূলের ৬ জন মন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাধা সত্ত্বেও মুকুল রায় রেলমন্ত্রী হন এবং দীনেশ ত্রিবেদীকে রেলমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এই পটভূমিতে সম্প্রতি নেত্রী এক বেসরকারি বৈদ্যুতিন চ্যানেল যা বলেছেন— তা বিভিন্ন পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি এবং পরে বিশ্লেষণ করছি।

উদ্ধৃতি— "কংগ্রেস মানি, মাসল আর মাফিয়াদের পার্টি। কংগ্রেস টাকার জোরে আর গায়ের জোরে ক্ষমতায় আছে। এটা দুর্নীতিগ্রস্তদের সরকার, দুর্নীতিগ্রস্তদের সরকার, দুর্নীতিগ্রস্তদের সরকার।" এ উপলব্ধি নেত্রীর কখন এবং কোনদিন থেকে হয়েছে? নেত্রী প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে বলেছেন মনমোহন সিং-এর সঙ্গে মাটির কোনও সম্পর্ক নেই। সমস্তরকম সৌজন্যবোধ ত্যাগ করে নেত্রী ভঙ্গী করে দেখালেন, মনমোহন সিং সমন্বয় কমিটিতে কীভাবে হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তা বলেন। স্মরণে আছে দেশে যখন জরুরি অবস্থা জারি করে আর এস এস-কে বেআইনি ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দমননীতির রথ চালাচ্ছিলেন ঠিক তখনই আর এস এস প্রধান বালাসাহেব দেওরস এক পত্রে ইন্দিরা গান্ধীকে সসম্মানেই সম্বোধন করেছিলেন। সেই সময় কিন্তু আজকের মুখ্যমন্ত্রী সেই জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর সভার সামনে ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস যে ন্যক্কারজনক ধুন্ধুমার কাণ্ড করেছিল তাতে এই নেত্রীর সক্রিয় ভূমিকা কি ছিল না?

সম্প্রতি নেত্রী তাঁর সতর্কবার্তা ঘোষণা করে বলেছেন, "আঞ্চলিক দলগুলির জোট হলে যোগ দিতে রাজি। 'সমমনোভাবাপন্ন' দলকে সমর্থনে রাজি। আমি প্রধানমন্ত্রী হতে 'চাই না'। কিন্তু পরবর্তী নেতা তৈরিতে 'সাহায্য' করবো।" নেত্রীর কথা থেকে পরিষ্কার বেরিয়ে এলো— (১) তিনি তৃতীয় ফ্রন্ট গঠন করতে চান। (২) সমমনোভাবাপন্ন অর্থাৎ তাঁর মতের সঙ্গে মিল আছে তাঁদের সঙ্গে ঐক্য করা। (৩) তিনি ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী গঠনের ব্যাপারে চালিকাশক্তি হতে চান। নেত্রীর রাজ্য-রাজনীতিতে একচ্ছত্র হয়ে এখন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একজন অন্যতম নেত্রী হতে চাইছেন। রাজ্য শাসনটাই যিনি সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারছেন না— তিনি অল ইন্ডিয়া লিডার হবেন কী করে? আসলে তাঁকে কিছু তোষামোদকারী সাংবাদিক 'বাঘিনী' ইত্যাদি বলে ফুলিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলেই একদিন চরম ব্যর্থতার গর্তে পড়ে যাবেন নেত্রী। এদিকে কলকাতা থেকে শিল্পপতিদের গ্লোবাল সামিট আগ্রায় চলে গেল।

এ রাজ্যের পক্ষে এটি একটি নিন্দা। রাজ্যে বিদেশি পুঁজির লগ্নী বাধা পাবে। রাজ্যে একদিকে যেমন সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের বেতন ছাড়া সব পেমেন্ট বন্ধ আছে— ঠিক তখন তিন কোটি টাকা খরচ করে মহাকরণকে সাজানো হচ্ছে। এবারে সিঙ্গুর দিবস-এ নেত্রী সিঙ্গুরে যেতে সাহস পেলেন না। রাজ্য এক অন্ধকারগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

মমতা, অমিতাভ, সোনিয়া, শাহরুখ ও এফ ডি আই

প্রিয় পাঠক,

শিরোনাম দেখে নিশ্চয়ই মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। যাবেই। যাতে যায় তার জন্যই তো লেখা। কিন্তু চিন্তা নেই। উত্তর আছে। এক উষ্ণ এবং শৈত্য সম্পর্কের গল্প আছে। সে গল্পে সিনেমা নেই। রাজনীতি আছে।

প্রথমে আপনাদের জানা দুটো গল্প পেশ করা যাক।

গল্প এক। গত বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালকে আমজনতার উৎসব বানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ইনটেলেকচুয়াল উৎসবকে টেনে নামিয়ে মা-মাটি-মানুষের পরব বানিয়েছিলেন। নন্দনের চৌহদ্দি থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধন করেছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান।

গল্প দুই। এই বছর সেই উৎসবের উদ্বোধনে আসছেন বিগ বি। মানে বিগ বচ্চন। শোলে, জঞ্জির, দিওয়ারের অ্যাংরি হিরো কিংবা চুপকে, শিলশিলার প্রেমিক কিংবা কৌন বনেগা ক্রোড়পতির ক্যুইজ মাস্টার এবার প্রদীপ জ্বালাবেন চলচ্চিত্র উৎসবের। মমতা তাঁকে উত্তরীয় পরাবেন। মালা পরাবেন। বাংলার কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত কোনও স্মারক উপহার দেবেন। জয়া ভাদুড়ির পতিদেবতাকে রীতিমতো জামাই আদর করবেন।

এবার একটা না জানা গল্প বলা যাক। ক্ষমতায় এসে মমতা যখন চলচ্চিত্র উৎসবের দখল নিলেন তখনই ঠিক করেছিলেন চমক চাই। বুদ্ধবাবু বিদেশী সিনেমা বুঝতেন। কিন্তু মমতা বোঝেন জনতা। তাই তাক লাগিয়ে দিতে হবে। উদ্বোধনেই এত আলো জ্বলবে যে সবাই বলবে, দেখিয়ে দিল মমতা। তখনই কথা উঠেছিল, বাংলার জামাই অমিতাভ বচ্চনকেই আনা হোক। এর থেকে বড় চমক আর কীই বা হতে পারে! কিন্তু রাজি হননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছিলেন, ওরে বাবা, ওটি করা যাবে না। অমিতাভকে আনলে ম্যাডাম রেগে যাবেন। ম্যাডাম মানে বুঝেছেন তো! ম্যাডাম মানে ম্যাডাম। দশ নম্বর জনপথের বাসিন্দা শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী। আসলে কংগ্রেসকে যতই গাল দিন না কেন গান্ধী পরিবারের নাম শুনলে এখনও মমতা নামে অগ্নিকন্যার আগুন দপ করে নিভে যায়। ভাবটা এমন যেন, আমার মাথা নত করে দাও গো তোমার চরণ ধূলার পরে...।

কেন রেগে যাবেন সোনিয়া গান্ধী? রাগবেন না! এককালে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে রাজীব গান্ধী ও তাঁর পরিবারের সম্পর্কটা নিশ্চয়ই মনে আছে? কিন্তু সেই সম্পর্ক তো এখন আর নেই। অমিতাভ বচ্চন, অমর সিং ও গান্ধী পরিবার উষ্ণ সম্পর্ক এখন ইতিহাস। বরং সেই সম্পর্ক এখন বেশ শৈত্য। কম্বল গায়ে দেওয়ার মতো ঠাণ্ডা। অমিতাভ পত্নী তো আবার সমাজবাদী পার্টির টিকিটে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের বিরোধী আসনে বসেন।

ইউ পি এ সরকারে থেকে গান্ধী পরিবার অনুগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে তাই বিগ বি-কে চলচ্চিত্র উৎসবে ডেকে আনা সম্ভব ছিল না। বরং কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের মালিক শাহরুখ খান ভাল পছন্দ ছিল। তাঁর সঙ্গে তো গান্ধী পরিবারের দারুণ সম্পর্ক। কংগ্রেসের হয়ে বাদশা যেমন প্রচার করেছেন তেমন আবার আই পি এল খেলায় গ্যালারিতে বসে গান্ধী পরিবারের দুই তরুণ প্রতিনিধি রাহুল ও প্রিয়াঙ্কাকে গলা ফাটাতে দেখা গেছে শাহরুখের দলের জন্য।

গান্ধী পরিবারের প্রিয় শাহরুখের দল নিয়ে অনেক নাচোন-কোঁদন দেখেছে এই রাজ্য। দেখেছে শাহরুখ খানকে রাজ্য সরকারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর বানিয়ে বেঙ্গল লিডস বিজ্ঞাপন বানানোও।

এবার ধাঁধার নিরসন দরকার। ইউপিএ-তে নেই তৃণমূল কংগ্রেস। এফ ডি আই বিতর্কে সরকার ছেড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। দিল্লীতে গিয়ে বিক্ষোভও দেখিয়ে এলেন। আর দিল্লী যাওয়ার ঠিক দু'দিন আগে জানিয়ে দিলেন অষ্টাদশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে আসছেন অমিতাভ বচ্চন।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্য বলে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন মমতা। এফ ডি আই নিয়ে মনমোহনের জাতির উদ্দেশে ভাষণের তীব্র নিন্দা করেছেন সরাসরি। চ্যানেলে বসে প্রধানমন্ত্রীকে ভ্যাঙাতেও কসুর করেননি তিনি। কিন্তু আজ পর্যন্ত পাঠকবৃন্দ মনে করতে পারছেন ম্যাডাম সম্পর্কে কোনওদিন, কোনও ইস্যুতে, কোনওখানে, কোনও মন্তব্য করেছেন মমতা? না, করেননি। এখনও তিনি বড়ই অনুগত।

কিন্তু আর নয়। লোকসভা ভোটে তৃতীয় ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেওয়ার যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন তাতে দশ নম্বর জনপথকে আক্রমণ না করে উপায় নেই। করতেই হবে। এখনই মুখ না খুললেও, আপাতত অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে সেই বার্তাই কি দিয়ে রাখলেন মমতা?

— **সুন্দর মৌলিক**

খুচরো বাজারে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশ
এক সর্বনাশাকে নিমন্ত্রণ

দেবব্রত চৌধুরী

মনমোহন সিং মনে হয় নিজের ভারতীয় রাষ্ট্রীয় নাগরিক হিসেবে পরিচিতি মুছে ফেলে বলতে চান "আমি বিশ্বনাগরিক"। বলতে চাইছেন স্থানীয় বলে আমার কিছু নেই, মুক্ত ভাবনা আমার দর্শন নয়--- আমাকে বিশ্বনাগরিক বানানো একটা প্রকল্প, একটা ডিজাইন— আমি এই প্রকল্পের অধীনে। আমি পরাধীন।

এই প্রকল্প আসলে একটা আগ্রাসনের গল্প। বাজার দখলের গল্প, উৎপাদন ব্যবস্থা দখলের গল্প, বন্টন ব্যবস্থার দখলে গল্প, সংস্কৃতি-মনন দখলের গল্প, দেশের প্রচলিত বাজার ধ্বংস করে উন্নয়নের নামে বিদেশী পুঁজিবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ—দাসত্বের নুতন যাত্রা শুরুর গল্প।

ইউ পি এ সরকার এফ ডি আই-কে ছাড়পত্র দিয়ে এদেশে বৃহৎ বহু রাষ্ট্রীয় কোম্পানীর আধিপত্য কায়েম করার সুযোগ দিয়ে সমগ্র বিপণন পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির নিয়ন্ত্রণ বিদেশী পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিতে চলেছে। এর ফলে দেশে বাড়বে বেকারি, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনা, লুঠ হয়ে যাবে দেশের সম্পদ। উদ্বৃত্ত হবে দেশের শ্রম। ফলে কমে যাবে শ্রমের মূল্য ও শ্রমের মর্যাদা। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশের খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ ও বহুরাষ্ট্রীয় কোম্পানীর অবাধ অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে। দেশের ব্যবসার সঙ্গে প্রায় দশ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। দেশের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে খুচরো ব্যবসার অংশ ১৪ শতাংশ। আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষই যুক্ত খুচরো ব্যবসায়ে। স্বনির্ভর ব্যবসা দেশের মানুষের একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। দেশবাসীর নিজস্ব উদ্যোগে দেশের সব প্রান্তে

> "চলতি বিপণন ব্যবস্থায় সরকার যদি নিয়ন্ত্রিত বাজার, সঠিকভাবে কৃষি সহায়ক মূল্যের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বেআইনি মজুতদারী, ক্রেতাস্বার্থ ইত্যাদির দিকে সঠিক, সদিচ্ছা নিয়ে নজর দিত তাহলে চলতি ব্যবস্থাটাকে এতটা অপদার্থ মনে হোত না। চলতি বিপণন ব্যবস্থার এই অপদার্থতা মেট্রো বা অন্যান্য বৃহৎ সংগঠিত অনুপ্রবেশ তথা আগ্রাসনের নৈতিক ভূমি তৈরি করে দিয়েছে।"

গড়ে উঠেছে ছোট বড়, হাট বাজার ও দোকান, যা কোটি কোটি দেশবাসীর জীবিকার একমাত্র মাধ্যম। এইসব হাট বাজার ও দোকানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যা আমাদের গ্রাম ও শহরের সমাজকে যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের দেশে বর্তমানে ১ হাজার মানুষ প্রতি ১১টি ক্ষুদ্র বা মাঝারী বিপণন কেন্দ্র আছে যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক। দেশে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ খুচরো বিপণন কেন্দ্র এবং কয়েক লক্ষ হাট বাজার আছে যা দেশের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের প্রয়োজন মেটায়। দেশে খুচরো ব্যবসায় গ্রাম শহর মিলিয়ে সবচেয়ে বেশী খুচরো দোকান আছে মহারাষ্ট্রে-১৩ লক্ষ, দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ--- ১২ লক্ষ, তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গে--- ১১ লক্ষ ৫০ হাজার। ২০০২-০৩ সালের একটি সমীক্ষায় জানা গেছে দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ যখন ছিল ১৪,৩০,৫৪৮ কোটি টাকা তখন খুচরো ব্যবসা থেকে আয় সৃষ্টি হয়েছিল ২,০৮,১২১ কোটি টাকা। এছাড়া মনে রাখতে হবে সারাদেশে সমবায় ভাবনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। যারা খুচরো ও পাইকারী বিপণন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে বন্ধ কারখানার বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রকল্পের শ্রমিক কর্মচারীরাও ক্রমশ যুক্ত হয়েছে খুচরো ব্যবসায়। একথা সত্যি যে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে যে খুচরো ও পাইকারী বিপণন ব্যবস্থা চালু আছে তাতে অনেক ত্রুটি আছে। চাষীরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের সঠিকমূল্য পাচ্ছেন না— এমনটাও দাবী করা হয়। উপভোক্তা বা কনজিউমারেরা অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে পুরো ব্যবস্থার ভিতটাই নড়িয়ে দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার কথা সরকার মাথায় রাখবে না এটা কোনও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না। চলতি বিপণন ব্যবস্থায় সরকার যদি নিয়ন্ত্রিত বাজার, সঠিকভাবে কৃষি সহায়ক মূল্যের প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বেআইনি মজুতদারী, ক্রেতাস্বার্থ ইত্যাদির দিকে সঠিক, সদিচ্ছা নিয়ে নজর দিত তাহলে চলতি ব্যবস্থাটাকে এতটা অপদার্থ মনে হোত না। চলতি বিপণন ব্যবস্থার এই অপদার্থতা মেট্রো বা অন্যান্য বৃহৎ সংগঠিত অনুপ্রবেশ তথা আগ্রাসনের নৈতিক ভূমি তৈরি করে দিয়েছে। সরকারের দায় স্বীকার না করে বরং বৃহৎ পুঁজিকে মদত দিচ্ছে। বিগবাজার বা স্পেনসার থেকেও মেট্রোর গুরুত্ব বেশি কারণ মেট্রোর ব্যবসায় অর্ধেকটাই খাদ্যদ্রব্য বা কৃষিজাত পণ্যকে ঘিরে যেখানে বহুলোক জড়িত। পশ্চিমবঙ্গে মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি তাই খুচরো বিপণনে বৃহৎ ও বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাক্ষেত্র। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ পরিবারের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ক্ষমতা গড়ে ৪৯৬ টাকা ৭০ পয়সা। অর্থাৎ দেশের মূল অংশটাই এই বিশ্বায়িত পণ্য বাজারের বাইরে আছেন। কিন্তু এদেশের কুড়ি শতাংশ যারা প্রায় ২৫ কোটির বেশি তারা আন্তর্জাতিকমানের শপিং ও ব্রান্ডের স্বাদ পেতে চায়। পণ্যের বাজারে ২৫ কোটি সংখ্যাটার গুরুত্ব অপরিসীম। এদের জগৎ তৈরি বিজ্ঞাপনের জগৎ থেকে। খোলা অর্থনীতির সুযোগ নিয়ে বিপণন সংস্থাগুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই ২৫ কোটি ভারতবাসীর বাজার ধরতে। তৈরি করা হচ্ছে ২৫ কোটি ভারতবাসীর নতুন ভুবন যেখানে ভারতবর্ষ নেই, যেখানে দেশের ঐতিহ্য বহনের দায় নেই, যেখানে দেশবাসীর আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। এই ক্রমশ একমাত্রিক মানুষরা চায় ভোগের অনন্ত জগৎ। বিপণন সংস্থাগুলি সেই জগতের দরজা খুলে দেয়, ওরা চায় ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে একটা অন্য ভারতবর্ষ যেখানে ওদের চিন্তটা গুরুত্ব পাবে। এই নয়া বিপণন ব্যবস্থার পাণ্ডারা বলছেন, এই ব্যবস্থায় চাষী বেশি দাম পাবে, তাদের অবস্থার উন্নতি হবে কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না।

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন সুপার মার্কেটে বিক্রী হওয়া কৃষিজ দ্রব্যের অংশ বিভাজনে যে সত্যটা জানা গেছে তা হলো :

ক্ষেত্র	আয়ের শতকরা বিভাজন
কৃষি শ্রমিকদের মজুরী	৫
কৃষি ফার্মের আয়	৪
সুপার মার্কেট	৪২
কমিশন-বেতন ও কর	৭
হ্যান্ডলির চার্জ	৭
পরিবহন	১২
কাস্টমস	৩
প্যাকেজিং	১৭

কৃষি ক্ষেত্রের কর্মী ও চাষীর উন্নতির কোনও চিহ্ন এই চিত্রে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি? আমাদের আমাদের প্রচলিত বিপণন ব্যবস্থার বদলে যদি বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতে তুলে দিই তবে কি হতে পারে—

(১) রাজ্যের প্রায় ৫০০ চালকল কাজ হারাবে।

(২) প্রায় ৪০০ কোল্ডস্টোরেজ বা হিমঘর বন্ধ হয়ে যাবে।

(৩) এ কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবে।

(৪) রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন হাজার হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যাবে।

(৬) হাট বাজারগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষি পণ্যের প্রায় ৫০ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বেকার হবে।

(৭) সেই সঙ্গে যুক্ত গ্রাম ও শহরের হাট বাজারের সঙ্গে যুক্ত মুটে, ভ্যানচালক, পরিবহনকর্মী সহ অন্যান্য জীবিকায় যুক্ত প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হবে।

(৮) বন্ধ হয়ে যাবে অসংখ্য হস্তশিল্প। কারণ সেগুলি আর বিপণনের জায়গা পাবে না। শপিংমলে বাংলার কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল জায়গা পায়নি। শপিংমলে স্তূপ হয়ে আছে চীন জাপান-কোরিয়ার পুতুল।

তাই বলতে দ্বিধা নেই সোনিয়া-মনমোহন সিং এফ ডি আই-কে ডেকে এনে দেশে এক 'সর্বনাশা'-কে নিমন্ত্রণ করতে চলেছেন।

সংকর্ষণ মাইতি

চিরন্তন মহিষাসুরমর্দিনী

প্রতি বছর মহালয়ার ভোরে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিশেষ অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে স্তোত্র-পাঠ বাংলা ছাড়িয়ে ভিন্ রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে— স্তোত্র-পাঠ জানিয়ে দেয় দুর্গাপুজো তথা শারদোৎসবের সূচনা হয়ে গেল। যেদিন থেকে মহালয়ার ভোরের এই স্তোত্র-পাঠ, সেদিন থেকে জনমানসে এই ধারণা হয়েছে যে, সত্যি-সত্যিই যেন পুজোর সূচনা হয়ে গেল। কিন্তু এর আগে যে দু' বছর (মহালয়ার ভোরে আকাশবাণীতে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'র আগের দু' বছর অর্থাৎ ১৯৩০ ও ১৯৩১ সাল) মহালয়ার ভোরে আকাশবাণীর বিশেষ অনুষ্ঠান ওই 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠিত হয়নি। তাহলেও কি মহালয়া জানান দেয়নি, যে, পুজোর সূচনা হয়ে গেল? হ্যাঁ, আকাশবাণীর ওই বিশেষ অনুষ্ঠান না হলেও মহালয়া তার আপন বৈশিষ্ট্যে জনমানসে রেখাপাত করেছে। শুধু ওই দু' বছর নয়, কয়েক শো বছর আগে থেকেই মহালয়া দুর্গা-পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেকথায় পরে আসছি। এখন কীভাবে বিজ্ঞজন কথিত তৃতীয় এপিক (মহাকাব্য) ওই মহিষাসুরমর্দিনী, মহালয়ার সঙ্গে জড়িয়ে গেল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য) মার্কণ্ডেয়- চণ্ডীর বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে একটি চম্পূ (গদ্যপদ্যময় কাব্য) রচনা করেন। ১৯৩০ সালে। নাম দেন 'বসন্তেশ্বরী'। ১৯৩০ সালে বাসন্তীপুজোর ষষ্ঠীতে আকাশবাণীতে প্রচারিত। সংগীত সংযোজনা পঙ্কজকুমার মল্লিক, ভাষ্য ও স্তোত্র পাঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ১৯৩১ সালে 'বসন্তেশ্বরী' রূপান্তরিত হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী'-তে। এবং বাসন্তী পুজোর সময় এটি সম্প্রচারিত না করে ১৯৩১ সালের শরৎকালে দুর্গাষষ্ঠীতে আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত করা হয়। আবার ১৯৩২ সালে দুর্গাষষ্ঠী থেকে সরিয়ে কয়েকদিন আগে মহালয়ার ভোরে সম্প্রচার করা হলো। উল্লেখ্য, শিল্পীদের নিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আকাশবাণীতে এক সময় সরাসরি (Live) অনুষ্ঠান করেছেন। ...১৯৩২ সাল থেকে মহালয়ার ভোরে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত টানা চুয়াল্লিশ বছরটা সম্প্রচার হলো। ১৯৭৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী রচিত, উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরী-পার্থ ঘোষ কর্তৃক ভাষ্যপাঠ, শ্যামল গুপ্ত রচিত গান— লতা, আশা, হেমন্ত, সন্ধ্যা, মান্না— সর্বভারতীয় শিল্পী সমন্বিত অনুষ্ঠান 'দেবীং দুর্গতি হারিণীম্' মহালয়ার ভোরে সম্প্রচারিত। পরে শ্রোতাদের বিক্ষোভ এবং পত্রপত্রিকায় পাঠক ও বিদ্বজ্জনেরা সমালোচনা করায় 'দেবীং দুর্গতি হারিণীম' বন্ধ করে দিতে হয়। ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনে রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক প্রমুখদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রসদনে সেদিন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এল কে আদবানীজী উপস্থিত ছিলেন। (১৯৭৭ সালে জনতা সরকার কেন্দ্রে)। যাই হোক, ১৯৭৬ সালে 'মহিষাসুরমর্দিনী' সম্প্রচারিত হয়নি, পরিবর্তে 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম্' সম্প্রচারিত হয়েছে এবং আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ যে বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন— এসবই আদবানীজীর কানে এসেছে। তিনি রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও

সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিকদের মতো প্রাক্তনীদের সংবর্ধনা সভায় পঙ্কজকুমার মল্লিককে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন—

"Mr. Mullick, Your Mahishashuramardini will be on the air again from the next Mahalaya." প্রাক্তনী হলেও পঙ্কজবাবুদের উল্লসিত হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালে আকাশবাণীর 'সঙ্গীত শিক্ষার আসর' পরিচালনা থেকে পঙ্কজবাবুকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আবার পরের বছর মহিষাসুরমর্দিনী বাতিল। এসব তাঁকে আহত করেছিল। তবে আদবানীজীর কথায় অক্সিজেন পেলেন। আবার মহালয়ার ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী বাজাবে। (১৯৭২ সালের রেকর্ডটাই মহালয়ার ভোরে পরিবেশিত হয়ে আসছে। অন্যমতে ১৯৭৩ সালের রেকর্ডটাই এখনও বাজানো হয়।)

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কোনও মন্তব্য করেননি। একবার কাজি নজরুল ইসলামকে ওঁর মনের মতো একটা মহালয়া পেশ করতে বলা হয়েছিল। উনি নারাজ বলেছিলেন— "আমার দ্বারা কি ওই রকম একটা জিনিস হয়?" স্বয়ং উত্তমকুমার মন্তব্য করেছিলেন— "ঠাকুরঘরকে রিনোভেট করে ড্রয়িংরুম বানালে যা হয়, তাই হয়েছে।"

(তথ্য— 'দেবীং দুর্গতি হারিণীম্'— ভবেশ দাশ। সকালবেলা- ৬।১০।২০১১)। ঠাকুরঘর হলো 'মহিষাসুরমর্দিনী' আর ড্রয়িংরুমটা দেবীং দুর্গতিহারিণীম্। অমন জনচিত্তজয়ী মহিষাসুরমর্দিনীর বিকল্প যে দেবীং দুর্গতিহারিণীম্ নয় তা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তমকুমারও।

১৯৭৭ সাল থেকে আদবানীজীর কথামতো মহালয়ার ভোরে আবার মহিষাসুরমর্দিনী শুরু। এ যাবৎ সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। দেবীং দুর্গতিহারিণীম্ একেবারে বাতিল করা হয়নি। মহাষ্টমীতে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।

দুর্গাপুজো ও মহালয়া

দুর্গাপুজো কি মহালয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে? পূর্বা সেনগুপ্তের 'মহালয়ায় পিতৃপক্ষের শেষ দেবীপক্ষের সূচনা' নিবন্ধে (বর্তমান ৭।১০। ১০) দেখা যায়, মহিষাসুরের নগর থেকে 'মহীশূর' কথাটির উৎপত্তি। আর এই নগরে বাস করেই মহিষাসুর নামে এক ভয়ানক দৈত্য অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। ...দেবকুল তাঁর অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শরণাপন্ন। তিন দেবতা এবং অন্যান্য দেবতার তেজে সৃষ্টি হলো এক দেবীর। তাঁর হাতে দেবদেবীরা অস্ত্র তুলে দিলেন। এবার মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধে মহিষাসুর নিহত। দেবী চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে বধ করেছিলেন। চামুণ্ডা পাহাড়ে এখনও চামুণ্ডা মন্দির বিদ্যমান। এই চামুণ্ডাই দেবী দুর্গা। কারণ, দেবী দুর্গা চামুণ্ডা রূপে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। ...মহালয়ার দিন থেকে মহীশূরে দেবীপক্ষ ও দেবী পুজোর শুরু। আবার পঞ্চদশ

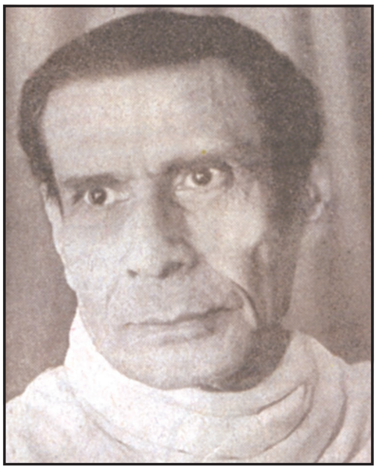

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

শতাব্দী থেকে দশেরা উৎসব শুরু। মহালয়া তিথিতে মহিষাসুর নিহত হয়েছিলেন,— এমনটি ওই নিবন্ধে উল্লেখ নেই। না থাকলেও ওখানে মহালয়া তিথিটি দেবীর পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনেক জায়গায় মহালয়ার দিনে দুর্গাদেবীর ঘটোদকের ব্যবস্থা করা হয়। ধারণা হয়, সেক্ষেত্রে অমাবস্যার পরেই শুক্লা প্রতিপদের সূচনাতেই ঘটোদক, দেবীপক্ষের সূচনা লগ্নেই। দুর্গোৎসবের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এক— মহালয়া, দুই— বোধন, তিন— সন্ধিপুজো। মহালয়া তিথিটিকে বলা হয়েছে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতিপর্ব। হিন্দুধর্মে যে কোনও শুভ কাজে যেমন বিয়ে উপনয়ন ইত্যাদিতে কাজের আগে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করতে হয় তেমন মাতৃ আরাধনার আগে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করে তিলজল নিবেদন করতে হয়। এর মূলে রয়েছে বিশ্বাস— কেউ মারা গেলেও তাঁর আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মার বিনাশ বা ক্ষয় নেই। পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্য মহালয়ার তর্পণ-শ্রাদ্ধ। তর্পণ-শ্রাদ্ধ শেষ করেই দেবী পক্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়া। মহালয়া হলো পিতৃপক্ষের শেষ ও দেবীপক্ষের শুরুর সন্ধিক্ষণ। বলা যায় মহালয়া দেবীপক্ষের শুরু। লোক বিশ্বাস— কৈলাস থেকে দেবীদুর্গা নাকি মহালয়া থেকে বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কাজেই মহালয়া তিথিটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে দুর্গা পুজোর ক্ষেত্রে।...

মহালয়া কথাটি এসেছে মহালয় থেকে। মহালয়ের অর্থ পরমাত্মা। বৃহৎ আলয়। সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের নাম মহালয়। ব্যাকরণগত দিক— মহান আলয় যাহাতে তাহা— বহুব্রীহি সমাস। মহালয় + আপ্- স্ত্রীলিঙ্গে মহালয়া। অন্যদিকে— মহালয়া যেহেতু একটি তিথি— এই তিথি শব্দটি সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ বলেই বিশেষণ হিসেবে শব্দটি হয়েছে মহালয়া। মহালয়া হলো শারদীয়া দুর্গাপুজোর পূর্ব অমাবস্যা— অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। (অমাবস্যা— অমা + বস্ + য, অধিকরণ বা + আপ্ স্ত্রীং। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। এই তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্যভাবে উদিত হয়। এবং সূর্যের সঙ্গে সমসূত্র ভাবে অবস্থিতি করে--- সমস্তরাত্রি অন্ধকার থাকে। ইংরেজিতে— 'Day of the new moon.)

স্কন্দ পুরাণে মহালয়া শব্দটি পাওয়া যায়। মাহেশ্বর খণ্ডে সমুদ্র মন্থনের কাহিনী রয়েছে। সমুদ্র মন্থনকালে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে অমৃত কুম্ভ উঠেছিল। (বর্তমান বিশ্বের উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলি সমুদ্র ও সমুদ্রের নীচ থেকে তেল সহ অন্যান্য সম্পদ আহরণে ব্যস্ত)। দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অমৃত নিয়ে বিবাদ। বিবাদ স্থলে দেবতাদের আহ্বানে দেবী মোহিনীর ছদ্মবেশে স্বয়ং বিষ্ণু অবতীর্ণ। ছলাকলা করে অমৃত পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দেবতারা অমৃত পান করে হয়েছিলেন অমর। অমৃত না পেয়ে অসুররা হয়েছিলেন মরণশীল।...

মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকি নাগকে মন্থনরজ্জু করে সমুদ্র মন্থন। মন্থনকালে অমৃতকুম্ভের দেবী অমৃতকুম্ভ নিয়ে উঠে এলেন। কারা আগে অমৃত পাবে এই নিয়ে দেবতা ও অসুরদের বচসা, বিবাদ। দেবতাদের আহ্বানে বিষ্ণু মোহিনীরূপে উপস্থিত। তাঁর রূপের ছটায় অসুররা সম্মোহিত। দৈত্যরাজ বলী বললেন— 'তুমি যেই হও, উপযুক্ত সময়ে তোমাকে পেয়েছি। অমৃত বন্টনের উপযুক্ত পাত্রী তুমি।'

মোহিনী ওরফে বিষ্ণু অসুরদের একটু পরখ করলেন— 'অচেনা নারীকে কি অমৃত বন্টনের ভার দেওয়া উচিত?'

বলীরাজ বললেন— 'দেবীর মহৎ আলয়ে অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করছি আমরা।'

মোহিনী বললেন— 'বেশ, তাহলে আজ তোমরা উপবাস করো। কাল উপবাস ভঙ্গের পর অমৃত পানের ব্যবস্থা হবে।'

পরের দিন উপবাস ভঙ্গের পর অমৃত পানের ব্যবস্থা। দেবতা ও অসুররা আলাদা আলাদা সারিতে। দেবী মোহিনী বললেন— 'দেবতারা অতিথি, এঁদের আগে অমৃত দেওয়া যেতে পারে। অতিথি সৎকার আগে করতে হয়। এটাই নিয়ম।'

দেবীর রূপের ছটায় অসুররা এতো সম্মোহিত যে ভালোমন্দ বোধটাই হারিয়ে ফেলেছেন। মোহিনী প্রথমে দেবতাদের অমৃত বন্টন করতে লাগলেন। তর সইছে না দেখে রাহু ও কেতু দেবতার ছদ্মবেশে দেবতাদের পাশে গিয়ে বসলেন। চন্দ্র ও সূর্য চিনতে পেরে ধরিয়ে দিলেন। অমনি মোহিনীরূপী বিষ্ণু চক্রের সাহায্যে রাহু ও কেতুর মাথা কেটে ফেললেন। মাথা ও ধড় আলাদা, কিছুটা অমৃত পানের জন্য মাথা দুটি কিছু সময়ে জন্য অমরত্ব লাভ করেছে। এবার প্রতিশোধের পালা। রাগে ওই মাথা দুটি মুখ হাঁ করে চন্দ্র ও সূর্যকে গিলে ফেললো। চন্দ্র ও সূর্যকে রাহু ও কেতুর গিলে ফেলার ঘটনাটি (পুরাণ-কথিত কাহিনী) পৃথিবীতে অশুভ 'গ্রহণ' রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। ধর্মীয় বিশ্বাস যাই থাক, ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণটি হলো— গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়া পতন দ্বারা চন্দ্র বা সূর্যের কিছু অংশ, আবার কখনও সর্বাংশ আদর্শই হলো 'গ্রহণ'।

যাই হোক, দেবতারা অমৃত পান করে অমর, অসুররা অমৃত বঞ্চিত হয়ে মরণশীল। দেবী মোহিনী হলেন দেবতাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ মহৎ আলয়। দেবী মোহিনীকে দেবতারা মহালয়া তিথিতে আরাধনা করেছিলেন। দেবী মোহিনী মহালয়া নামে স্বীকৃতি পেলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শ্রীশ্রী চণ্ডীর অংশে আছে, দেবী দুর্গা যেসব অসুরদের বিভিন্ন রূপে বধ করেছেন যেমন কুম্ভ নিকুম্ভ বাতাপি, মহিষ প্রমুখদের, এঁরা সবাই অমৃত পানের দিন উপস্থিত ছিলেন। এইসব অসুরদের ধ্বংসের প্রাথমিক পর্বটুকু সেরে রেখেছিলেন দেবী মোহিনী। অসুরদের অমরত্বলাভে বাধা হয়েছিলেন তিনি। আবার দেখা যায়, দ্বিভুজা মোহিনী হয়েছেন যোদ্ধা দশভুজা, দ্বিভুজা মোহিনী হলেন বিষ্ণু, আর দশভুজা হলেন দেবী দুর্গা। দ্বিভুজা মোহিনী পরে দশভুজা— ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকছে তাই না? দশভুজা দুর্গার আবির্ভাব হয়েছিল ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাদের মুখমণ্ডলের তেজরশ্মি থেকে। কাজেই দুর্গার অংশী বিষ্ণু ওরফে দেবী মোহিনী— দ্বিভুজা— দেবতাদের কাছে তিনি মহালয়া— আশ্রয়স্থল— মহৎ আলয়। (দেবী দুর্গাও মর্ত্যবাসী ও দেবতাদের কাছে আশ্রয় স্থল)।

মর্ত্যের মানুষ মহালয়া তিথিটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে থাকেন। পিতৃপুরুষের তর্পণ-শ্রাদ্ধের দিন হিসেবে। পুরাণ বাদ দিয়ে মহালয়ার পেছনে কোনও মহাজাগতিক কারণ আছে কিনা দেখা যাক।

কথিত আছে, আজ থেকে ১৪,৪২৯ বছর আগে ১৬ ভাদ্রের অমাবস্যা তিথিতে এক মহা-লয় অর্থাৎ মহাপ্রলয় হয়েছিল। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে (Swelling of water in the Sea. এর ছোট্ট সংস্করণ সুনামী Tsunami--High sea-wave.) সমগ্র পৃথিবীর স্থলভাগ জলের তলায়। পামীর মালভূমি সহ কিছু কিছু পার্বত্য এলাকা ডুবতে বাকি ছিল। সে সময়কার হিসেবে কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলেন। বহু জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। পার্বত্য এলাকায় যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা জল সরে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। হাজার হাজার বছর পরে হলেও আর্যরা আমাদের ভারতে আসেন। তখন ভারতে অনার্যরাও ছিলেন। আর্য ঋষিগণ বৈদিক যুগে হাজার হাজার বছর আগের ওই ১৬ ভাদ্রের অমাবস্যায় সংঘটিত মহাপ্রলয়ে মৃতদের উপলক্ষ্য করে মঘা নক্ষত্রে বিষুব মিলন কালীন সূর্যকে 'পিতৃগণ' নামে স্তব করেছিলেন। ভাদ্র মাসের অমাবস্যার ১৪ দিন পূর্ব থেকে নানান অর্ঘ্য দিয়ে সূর্যের উপাসনা চালু করেছিলেন। 'পিতৃগণ' নামধারী সূর্যই হলেন পূর্বপুরুষ।

শ্রী তপন আচার্য তাঁর 'মহালয়া' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন—

"কালক্রমে দেবতাদের স্বরূপ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় 'পিতৃগণ' নামধারী সূর্যার্ঘ্য দান রূপান্তরিত হয়েছে পিতৃপুরুষের তর্পণে।"

দেখা যাচ্ছে, ভাদ্রের অমাবস্যা তিথিটি যে মহালয়া নামে চিহ্নিত হয়েছে এর উৎস বোধ হয় ওই মহা-লয় অর্থাৎ মহাপ্রলয় থেকে। (মহালয় স্ত্রীলিঙ্গে মহালয়া)। আবার তর্পণ-শ্রাদ্ধে দেখা যায়, তর্পণকারী জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিলজল পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছেন। আর্য-ঋষি-নির্দিষ্ট সূর্যই 'পিতৃগণ' তথা পিতৃপুরুষ তথা পূর্বপুরুষ।

পুরাণ-কাহিনীগুলি মাথায় রেখে অর্থাৎ মান্যতা দিয়ে বলা যেতে পারে, সূর্যই আমাদের মহা-আলয়— সমগ্র জীবজগৎ তাঁর মহৎ আলয়ে প্রতিপালিত। "পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্য দেবো ভব"— এই আপ্তবাক্যটিকে মূলধন করে দেবতার জ্ঞানে জন্মদাতা পিতা-মাতা, শিক্ষাদাতা শিক্ষককে আশ্রয় করে আমাদের চলমান জীবনচর্যা। আবার দেশবরেণ্য এবং বিশ্ববরেণ্য মনীষীরাও একেকজন মহৎ আলয় বা মহালয়। কাজেই মহালয় কথাটি বা শব্দটি এখানে বহুমাত্রিক হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে। মহালয় থেকে মহালয়া— আগেই আলোচনা হয়েছে।

তর্পণ

মহালয়ার মূল আকর্ষণ তর্পণ-শ্রাদ্ধ। পিতৃপক্ষে। পিতৃপক্ষ কাকে বলে? ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যখন সূর্য (রবিগ্রহ) কন্যারাশিস্থ হয় তখন তাকে পিতৃপক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। তিথির সময়ের হ্রাস, বৃদ্ধি ও মলমাসজনিত কারণে মহালয়ার অমাবস্যা তিথিটিও পিছোতে বা এগোতে পারে। এই যেমন মলমাসের কারণে ২০১২ বাং ১৪১৯ সালের মহালয়া বেশ পিছিয়ে গেল। বাংলা মাসে (একই মাসে) যদি দুটি অমাবস্যা পড়ে তাহলে মল মাসের সূচনা হয়। হিন্দুদের শুভ ক্রিয়াদি নিষিদ্ধ। পুজোপার্বণ ও পিছিয়ে যায়। যাকে নিয়ে এই নিষিদ্ধকরণ হলো, সেই অমাবস্যার উৎস নামকরণ একটি বিস্ময়কর উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে।

পুরাকালে সোমপথ নামে একটি স্থান ছিল (মতান্তরে ব্যক্তিবিশেষ)। সেখানে দেবপিতা মারীচনন্দনরা বাস করতেন। এঁরা তপস্যা করতেন। তাঁদের তপস্যা ও ইচ্ছা অনুযায়ী একটি পরমাসুন্দরী মানসকন্যার জন্ম হয়। সেই কন্যা আবার নদীর রূপ নিল— নাম অচ্ছোদা। এই অচ্ছোদা আবার দেব পিতাদের মতো তপস্যা করেন। একবার দেব পিতারা তাঁকে দেখতে এলেন। অচ্ছোদা তাঁদের প্রণাম করলেন। দেবপিতাগণ এতো রূপবান ছিলেন যে তাঁদের দেখে অচ্ছোদা অভিভূতা হলেন। অচ্ছোদা সবচেয়ে রূপবান অমাবসুকে দেখে কামার্ত হয়ে তাঁকে কামনা করে বসলেন। অমাবসু দেখলেন, অচ্ছোদা ব্যাভিচারিণী হয়ে মানসপিতাকে কলঙ্কের পাঁকে ফেলতে চাইছে। সমাজে পিতা ও কন্যার যে সম্পর্ক তা তো রক্ষা হবে না! কামার্ত কন্যার ইচ্ছা পূরণ করতে দেওয়া হবে না। তিনি কঠিন আচরণ প্রয়োগ করে অচ্ছোদার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। যে দিনে, যে তিথিতে অচ্ছোদা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন সেই দিনটি 'অমাবস্যা' নামে চিহ্নিত হয়ে গেল। এই কাহিনীটি রয়েছে মৎস্যপুরাণে।

যে কোনও অমাবস্যাতে তর্পণের বিধি-ব্যবস্থা নেই। কেবলমাত্র পিতৃপক্ষে

পক্ষকাল ব্যাপী তর্পণের কথা বলা হয়েছে। আবার তর্পণ বা তর্পণ-শ্রাদ্ধ পক্ষকাল ব্যাপী হলেও মহালয়া তিথিটি সবচেয়ে প্রশস্ত সময়।

"কন্যা গতে সবিতারি, পিতরৌ যান্তি বৈ সুতান্
অমাবস্যা দিনে প্রাপ্তে, গৃহদ্বারং সমাশ্রিতা।"

রবি রাশিমণ্ডলে কন্যারাশিতে থাকাকালীন আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যার দিনে পিতৃপুরুষগণ (প্রয়াত) নিজেদের জীবিত উত্তরপুরুষের কাছে সূক্ষ্মদেহে এসে আশ্রয় নেন এবং গৃহের দোরের কাছে অবস্থান করেন। উত্তরপুরুষের কাছে একটু তিলজলের জন্য তাঁদের আসা। কোত্থেকে তাঁরা আসেন? যমলোক থেকে আসেন। অনেকের ধারণা--- যম, যমলোক, একটা ভয়ঙ্কর নাম, ভয়ঙ্কর স্থান। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। হ্যাঁ, জীবমাত্রই মরণশীল। অনেকের ধারণা--- মৃত্যুর পরেই যমলোকে গমন--- যেখানে শুধুই যন্ত্রণা ভোগ। নরক-যন্ত্রণা-ভোগ। না মোটেই তা না। আমৃত্যু ইহলোকে স্থান, মৃত্যুর পর পরলোকে স্থান। এই পরলোকের দেবতা হলেন যমরাজ— দেবতা না বলে 'ধর্মরাজ' বলাই ভালো। এই ধর্মরাজ যমরাজ কোথায় কীভাবে থাকেন?

যমের পিতার নাম সূর্য। যমুনার দাদা যমরাজ। বিশাল দেহী। গায়ের রঙ গাঢ় পিত্ত, পিঙ্গলবর্ণ কেশ, দু'হাতে দণ্ড ও পাশ, বাহন হলো মহিষ। ভারি চেহারার ভারি বাহক। ইনি সৎকর্মনিষ্ঠ। যম যেখানে থাকেন সেখানে চিরদিবস। আবার যে ভবনে থাকেন সেটি আবার 'দেব নির্মিত।' মৃত্যুর পর প্রতিটি মানুষ তাঁর কাছে গমন করেন। কেন গমন করেন? পরলোকে বিশ্বাসী মানুষ। পরলোকে ইনি ভাগ্যনিয়ন্তা— কর্মফলের ফলদাতা। যমলোকে যাওয়া মানে নরকগমন না, তিনি সুখময় দেশে নিয়ে যান— যেখানে চিরদিবস, জলদ্বারা শোভিত, চির জ্যোতিথান। তাঁর ভবনটিও দেবনির্মিত--- সংগীত ও বংশীধ্বনিতে মুখরিত। (তথ্য— মহালয়া— বর্তমান ৭।১০।২০১০)।

হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গ-নরকের কথা যেমন, তেমন মুসলিম-শাস্ত্রে বেহেশ-তদোজখ, খৃস্টান-শাস্ত্রে Heaven-Hell. ভালো কাজে স্বর্গবাস, খারাপ কাজে নরকবাস। ইহলোকের কর্মফল, পরলোকে প্রাপ্তি। (বিশ্বাস মানুষের)। এটি সচেতন বাক্য। মানুষ হয়ে জন্মেছ, মনুষ্যত্বের স্বাক্ষর রেখে যাও। ইহলোকে ভালো কাজ করলে পুণ্যলাভ— সুখ শান্তি। খারাপ কাজ করলে পাপকর্ম— দুঃখ ভোগ। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় একটি সুন্দর কথা বলেছেন— "পাপের ফলে দুঃখ, পুণ্যের ফলে সুখ— দুটিই কিন্তু ইহকালের কর্মফলের বেতন প্রাপ্তি।"

এতো সেই কথাটির অনুরণন— "কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গনরক-মানুষেতেই সুরাসুর।" যতই হোক মানুষ কিন্তু ইহলোক পরলোকে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী বলে সেই বিশ্বাসটা এখনও টোল খায়নি— মানুষ মারা গেলেও তার আত্মা অবিনশ্বর— পরলোক অর্থাৎ যমলোকে তাঁর অবস্থিতি। পিতৃপক্ষে যমলোকের খোলাদ্বার দিয়ে বেরিয়ে মর্ত্যলোকে চলে আসেন সূক্ষ্ম শরীরে— উত্তর- পুরুষের

হাতে একটু তিলজল পাওয়ার আশায়। "যমলোকং পরিত্যাজ্য আগতা যে মহালয়ে।"... মহালয়াই তাঁদের লক্ষ্য। কারণ, তর্পণ-শ্রাদ্ধের প্রশস্ত দিনটি তো এদিনই। তর্পণ হলো--- "তৃপ্যান্তি পিতরো য়েন তৎপণয়।" অর্থাৎ পিতৃপুরুষ যে বস্তু প্রদানে প্রসন্ন হন তাকে তর্পণ বলে। সামান্য তিল জলেই পরিতৃপ্তি। যজুর্বেদ অনুসারে অঞ্জলি দানের মন্ত্রটি এই রকম—

"ওঁ উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালাং প্রিশ্রুতং, স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃণ্।"

"গোত্র-অমুক, পিতা অমুক, দেবশর্মা— তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা..."। (তিনবার উল্লেখ)। তর্পণকারী মন্ত্রোচ্চারণ করেন। এবার স্বতিল জল প্রদান—

"ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্ব পোহঞ্জলিং"। আমার পিতৃগণ, আসুন এই অঞ্জলি পরিমিত জল গ্রহণ করুন।

যাঁরা এদিন তর্পণ করতে কোনও কারণে পারেননি, তাঁরা দীপান্বিতার দিন করতে পারেন। তর্পণ শেষে একটুকরো কাঠে জ্বলন্ত কয়লার টুকরো জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়। ওই আলো দেখে যমলোকে ফিরে যাওয়া। আবার কোথাও উল্কাদান। উল্কার আলোর পথ ধরে যমলোকে ফিরে যান অশরীরী আত্মারা। (আত্মাকে সূক্ষ্ম শরীরও বলা যেতে পারে।) মহালয়ায় আসা— দীপান্বিতায় ফিরে যাওয়া।

"যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়া
উজ্জ্বল জ্যোতিষাবর্ত্ম প্রপণ্যন্তো ব্রজন্তুতে।"

মহালয়ায় তর্পণ-শ্রাদ্ধ করলে পিতৃপুরুষরা আশীর্বাদ করেন। আবার তর্পণের দিন পর্যন্ত কৃত্যপাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। "যাবজ্জীবকৃতং পাপং, তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।" মহালয়া হলো আত্মোপলব্ধির দিন। পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সহ তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা যেমন আছে, তেমন তাঁদের প্রদর্শিত পথে চলা এবং ভালোভাবে থাকার প্রার্থনাও করেন তর্পণকারীরা।

মহালয়া মাহাত্ম্য

মহালয়ায় তর্পণ-শ্রাদ্ধ হলো পূর্বপুরুষদের নিমিত্ত স্মরণ-অনুষ্ঠান। আমরা তো প্রতি বছর প্রয়াত মনীষী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে স্মৃতি তর্পণ করি। বিভিন্ন দিনে। এও তেমন। তবে পার্থক্য আছে। শাস্ত্রীয় বিধি ও মন্ত্রোচ্চারণ করে প্রয়াত পিতামাতা থেকে বৃদ্ধ পিতামহ-পিতামহী, বৃদ্ধ মাতামহ-মাতামহী সহ অনেককে একসঙ্গে তিলজল নিবেদন করে তাঁদের স্মরণ করা হয় একই দিনে, কোমর-জলে দাঁড়িয়ে। এ তো পারিবারিক তর্পণ-শ্রাদ্ধ। এর বাইরে পুরোহিতমশাইরা তর্পণকারীকে দিয়ে জগৎসংসারের সর্ব প্রাণীর জন্য তিল-তর্পণ (জলসহ) করিয়ে নেন। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীমশাই মহালয়া সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে (ব্রহ্মা থেকে তৃণরাজি, সবাই ভালো থেকো। আনন্দবাজার পত্রিকা-৭।১০।১০) সুন্দর

আলোকপাত করেছেন।

পিতৃমাতৃ তর্পণের পর লক্ষ্মণ তর্পণ করতে দেখা যায়। সংক্ষিপ্ত এই তর্পণ। 'সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে তৃণরাজি-এ জগতের সকলেই তৃপ্ত হও— 'আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু'— তর্পণকারী উচ্চারণ করেন এই মন্ত্র।... সংসারে স্বাভাবিক মৃত্যু যেমন আছে অস্বাভাবিক মৃত্যু যেমন— কেউ অ্যাক্সিডেন্টে, কেউ সাপে কাটায়, কেউ আগুনে পুড়ে, কেউ সুই-সাইডে আত্মহত্যা করে মারা গেলে তাঁরাও অর্থাৎ তাঁদের আত্মাও তর্পণ—জলটুকু আশা করেন। আবার যাঁদের কেউ কোত্থাও নেই অথচ সমাজ, দেশের হয়ে কাজ করে গেছেন, পিতামহ ভীষ্মের মতো তাঁদের জীবন,— এঁদের মৃত্যুর পর আত্মার শান্তির জন্য কেউ কি তর্পণ করে তিলজল অর্পণ করবেন না? হ্যাঁ, এঁদের জন্যও তর্পণকারীরা শ্রদ্ধাভরে তিলজল অর্পণ করেন। এই ধরনের তর্পণকে ভীষ্ম তর্পণ বলে অভিহিত করা হয়েছে শাস্ত্রে।

সমগ্র বিশ্বে যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয়। শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি সম্পাদিত 'আহ্নিক কৃত্যম্' পুস্তকে প্রথম খণ্ডে তর্পণ বিধিতে রয়েছে—

"অতীত কুল কোটিনাং সপ্তদ্বীপ বাসী নাং
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।।"

অর্থাৎ— "অতীতে বহু কোটি কুল, বহু জন্মান্তরে গত হইয়াছে সেই সেই কুলের পিতৃপিতামহাদি ও সপ্তদ্বীপবাসী মানবগণের পিতৃপিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের যাবতীয় পদার্থ আমার প্রদত্ত-জলে তৃপ্ত হউক।"

এখানে সপ্তদ্বীপবাসী বলতে সাতটি মহাদেশের কথা বলা হয়েছে। আবার স-প্রাণ প্রাণী, উদ্ভিদ শুধু নয়, জড়বস্তু বা জড় পদার্থ সকলকে তৃপ্ত করার কথা বলা হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে হিন্দুদের তর্পণ-শ্রাদ্ধ হলো পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার অনুষ্ঠান। মুসলমানরা মোমবাতি জ্বালিয়ে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেন 'শবেবরাত' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। খৃস্টানরা সারারাত বাড়ির ছাদে বা বাইরে আলো জ্বালিয়ে (সাধারণত মোমবাতি জ্বালানো হয়) পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেন। আগেকার দিনে কোনো সমাধির ওপর লাইট হাউস বা বাতিঘর তৈরি করা হোত। কারণটা কি? কারণ হলো সেই বিশ্বাস— মানুষের বিশ্বাস, মৃত মানুষের আত্মাকে পথ দেখিয়ে স্বর্গে নিয়ে যায় বাতিঘরের আলো। সমাধির ওপরে এরকম একটি প্রাচীন বাতিঘর তৈরি হয়েছিল খৃস্টাপূর্ব ২৮০ সালে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে। বাতিঘরটির উচ্চতা ছিল চারশো ফুট। নাম— 'ফ্যর'। মধ্যপ্রাচ্যেও এই বিশ্বাস নিয়ে বাতিঘর হয়েছিল। তবে এই সব বাতিঘরগুলির এখন অস্তিত্ব নেই। খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন বাড়ির ছাদে যিশুখৃস্টের জন্মদিনে আলো জ্বালালে পূর্বপুরুষরা ওই আলোর পথ ধরে নেমে এসে বর্তমান প্রজন্মকে আশীর্বাদ করেন। ঠিক যেন আমাদের কার্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ জ্বালানোর মতো ব্যাপারটা।...

এক সময় শুভ মহালয়া তিথিতে নতুন নতুন গানের আত্মপ্রকাশ হোত। আবার সিনেমার ছবিও মুক্তি পেত। অরবিন্দ মুখার্জির 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' ও 'মন্ত্রমুগ্ধ' ছবি দুটির শুভমুক্তি হয়েছিল মহালয়ার দিনে। এমনি আরও। বর্তমানে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রেডিয়োতে দেবী দুর্গার ওপরে সংগীত-বীথি 'মহিষাসুরমর্দিনী' এবং টিভিতে সচিত্র কাহিনি পরিবেশিত হচ্ছে মহালয়ার ভোরে। এছাড়া কী শহর, কী আধাশহর, কী মফঃস্বল— সব জায়গা থেকে বাঙালির কাঙ্ক্ষিত সাহিত্য সমৃদ্ধ শারদ সংখ্যাগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে মহালয়ার পুণ্যলগ্নে।

পরিশেষে,---মহালয়ায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ-শ্রাদ্ধ---এটি একটি শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া হলেও এর বিশ্বজনীন চিন্তা-দর্শনটি অতি চমৎকার ---উঁচু তারে বাঁধা। ধনী-গরীব, জ্ঞানীগুণী থেকে অতি সাধারণ তর্পণকারীর শ্রদ্ধার্ঘ্য--- 'অঞ্জলি-পরিমিত-জল'--- নিজ পারিবারিকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে, দেশ ও কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রয়াত মানুষদের প্রতি অর্পিত হচ্ছে। এখানেই তর্পণ-শ্রাদ্ধের সার্থকতা— এখানে মহালয়া নাম্নী তিথিটিরও সার্থকতা। বর্তমান প্রেক্ষিত নিয়ে দু-চার কথা। 'পুৎ' নামক নরক থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য কিংবা বংশ রক্ষার জন্য পুত্রের কামনা বাবা মায়ের। প্রয়াত হওয়ার পরও এঁদের বিদেহী আত্মা আকাঙ্ক্ষা করে মহালয়ায় পুত্রের হাতেই তিলজল গ্রহণ করবে। কারণ, তর্পণের প্রথম অধিকারী হলেন পুত্র। জীবদ্দশায় হয়তো অনেক বাবা মা পুত্রের হাতে অন্নজল পান না। এতে ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ অভিমান নেই স্নেহপ্রবণ বাবা মায়ের। আবার পুত্রের অসুখ, বিসুখ, কষ্ট যন্ত্রণার সময়ে বাবা মায়ের চোখে ঘুম নেই— পুত্র, পুত্রবধূর পাশে তাঁরা। এক সময় জাগতিক নিয়মে ইহলোক থেকে বাবা মায়ের ছুটি। স্থান হয় পরলোকে। আত্মা তো অবিনশ্বর, পরলোক থেকে বিদেহী আত্মা মহালয়ার পুত্রের তর্পণের দিকে তাকিয়ে— মহালয়ায় আসার জন্য উন্মুখ— তিলজল পুত্রের হাত দিয়ে প্রাপ্তি ঘটুক আর না ঘটুক—পুত্রসহ উত্তরসূরির মঙ্গল কামনায় তাঁদের আসা। এটাই ভারতীয় দর্শন— অপত্য স্নেহের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের উজ্জ্বল নিদর্শন।

তথ্যসূত্র :

□ 'দেবীং দুর্গতি হারিণীম্'— ভবেশ দাশ— 'সকালবেলা- ৬।১০।২০১১।

□ তর্পণ-দর্পণে আত্মদর্শন— ইন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় —বর্তমান- ২২।৯।২০০৬।

□ মহালয়ার মহৎ আলয়--- ইন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়— বর্তমান—১০।১০।২০০৭।

□ মহালয়া--- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়--- বর্তমান— ৭।১০।২০১০।

□ মহালয়ায় পিতৃপক্ষের শেষ, দেবী পক্ষের সূচনা--- পূর্বা সেনগুপ্ত--- বর্তমান--- ৭।১০।২০১০।

□ ব্রহ্মা থেকে তৃণরাজি— সবাই ভালো থেকো— নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী— আনন্দবাজার পত্রিকা— ৭।১০।২০১০।

□ পিতৃপক্ষে তর্পণ--- কুশল সেন--- শারদীয়া ভাগ্যফল— ১৪১৬।

□ মহালয়া— মহামায়ার আবাহন— তপন আচার্য— শারদীয়া ভাগ্যফল—১৪১৬।

□ পস্তক—'আহ্নিক কৃত্যম্'— শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।

□ 'আজ মহালয়া'--- সংকর্ষণ মাইতি---কথিকাপাঠ--- ১৮।৯। ২০০৯--- আকাশবাণী কলকাতা 'কেন্দ্র--- সন্ধ্যা ৭টা (কৃষিকথার আসর)।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

—— সঃ স্বঃ

চিঠিপত্র

আচার্য কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে

'স্বস্তিকা'র ২৭ আগস্ট ২০১২, সংখ্যায় 'জন্মশতবর্ষে অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী' সম্বন্ধে লেখাগুলো পড়তে পড়তে স্বাভাবিকভাবেই মনটা অতীতে চলেই গেল। স্মৃতির সরণীতে ভেসে এল আচার্য কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার মেলামেশার স্মরণীয় মুহূর্তগুলো। ভেবে দেখলুম এখনই মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত স্মৃতির সেইসব মধুর মুহূর্ত পাঠকদের সামনে রাখা খুবই জরুরি।

আমি দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের ওপর হাওড়া শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউটে (ব্রাঞ্চ) শিক্ষকতা করেছিলুম। হাওড়ার শিক্ষাজগতে তাঁর নাম আগেই শুনেছি। তাই তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগ্রহ সহকর্মী বন্ধুদের জানালে একদিন স্কুলের নিকটস্থ একটি মাঠে সভার পর বন্ধুরা আচার্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। দীর্ঘদিন কেটে গেছে। তাই সভায় উনি কি বলেছিলেন আজ আর মনে নেই! তবে তাঁর সমগ্র ভাষণটি ছিল তেজোদীপ্ত, অনুপ্রেরণাময়।

আচার্য চক্রবর্তী দীর্ঘদিন হাওড়া গার্লস কলেজের (বর্তমান নাম হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) সহাধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তীকালে অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। সহাধ্যক্ষ থাকার সময় স্কুল-ফেরত আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতুম। অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ, মধুর আলাপ হোত। অনেক সময় অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং তাঁকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখেছি। আলাপের কোনও কথা আজ বলতে পারবো না! কেননা সময়ের সঙ্গে সগে সেই সব কথা বিস্মরণের অন্তরালে চলে গেছে। কিন্তু তাঁর এমনই অমায়িক ব্যবহার যে, পদমর্যাদায় বড় হয়েও কখনও এই তরুণ শিক্ষককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেননি! এমনই ছিল আচার্য চক্রবর্তীর শিক্ষার ঔদার্য।

একবার আমাদের স্কুলে বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উনি বক্তব্য রেখে সমগ্র পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠানটি সঞ্জীবিত করে গেলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি রূপে।

এরপর দিন-মাস-বছর কাটতে লাগল। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলো। স্বাধীনভাবে লেখা ও বক্তব্য রাখা বন্ধ হয়ে গেল! ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পূজারী, স্বাধীন চিন্তার অধিকারী আচার্য চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিধান মেনে নিলেন না! আন্দোলনে নামলেন। ফলে কারারুদ্ধ হতে হলো তাঁকে। বেশ কিছুদিন কারান্তরালে থাকতে হলো। অবশেষে মুক্তি পেলেন। কলেজে ফিরে এলেন আবার। কিন্তু হাজার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জেলে অন্তরীণ থাকার সময়ের বেতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে সত্ত্বেও গ্রহণ করলেন না! কারণ তাঁর যুক্তি ওই সময়ে তিনি কলেজের কোনও কাজ করেননি। কতটা নীতিনিষ্ঠ ও চরিত্রবলের অধিকারী ছিলেন তিনি। সেটাই সকলের সামনে প্রমাণ করলেন আরেকবার।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। জরুরি অবস্থার অবসানে মুক্ত হয়ে বাড়ী থেকে বেরোবার পথে একদিন রাস্তায় আমায় দেখে গভীর আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করলেন। আমি এতটা আশা করিনি! কিন্তু সেই প্রেম-স্মৃতি কোনওদিন ভোলবার নয়। আজও তার উত্তাপ অনুভব করি।

কর্মরত অবস্থায় আচার্য চক্রবর্তীকে শেষ দেখি ডালমিয়া পার্কে পরম পূজনীয় বালাসাহেব দেওরসজীর সভায়। বক্তব্য যা কিছু দেওরসজীর। তাঁর কিছু নয়। স্বাভাবিক কারণেই এখানে ওঁর সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। তার কিছুদিন পরে ঘটে তাঁর মহাপ্রয়াণ। শিক্ষা, সংস্কৃতি জগৎ হারায় তার এক নিবেদিত সেবককে।

বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে আচার্য চক্রবর্তীর মতো সর্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বিরল। তাঁকে আরেকবার আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

—রণজিৎ সিংহ, কলকাতা-৭০০০৩৬।

এক কলঙ্কিত অধ্যায়

বিশে সেপ্টেম্বর এন ডি এ ভারতবন্ধের ডাক দেয় এবং সমস্ত ভারত জুড়ে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিভিন্ন দলের মতামত যাচাই না করে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণা করে এবং রান্নার গ্যাসের উপর ভর্তুকি হ্রাস করে। আরও মারাত্মক বিষয় হলো খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী পুঁজি লগ্নি করার ছাড়পত্র মঞ্জুর হয়েছে। এইসব জনবিরোধী নীতি জনজীবনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সংকট নিরসনের জন্য এইসব পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যদিকে বিগত দু-তিন বছর ধরে একের পর এক দুর্নীতি ফাঁস হয়েছে। সম্প্রতি কয়লা ব্লক বন্টনে চরম দুর্নীতি প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আর্থিক কেলেঙ্কারির ফলে লোকসান হয়েছে। একদিকে মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে তছনছ করে তুলেছে। কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতি ও অপশাসনের ফলে ভারতের ইতিহাসে কলঙ্কিত অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তার বেহাল দশা। ভারতের পূর্বে অনুপ্রবেশ আর পশ্চিমে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট উগ্রপন্থী গোষ্ঠীদের তাণ্ডব। এর মূলে রয়েছে ভারতের ক্ষমতাসীন দলগুলির নিষ্ক্রিয় মনোভাব ও তোষণ নীতি। ধর্মনিরপেক্ষতার বুলির আড়ালে ভারত-বিরোধী উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ নীতি গ্রহণ না করার মানসিকতা।

—প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৭০০০৬৪।

জাতিদাঙ্গার সংকেত

শুধুমাত্র গদিতে টিকে থাকার জন্যে দেশের স্বার্থ বলি দিয়েও যেনতেন প্রকারে সংখ্যালঘু ভোট কব্জা করার জন্য তাদের প্রতি অযাচিত তোষণ ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি ঔদাসীন্য ও দুর্বলতা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে সাম্প্রতিককালের অগ্নিগর্ভ অসমের দৃষ্টান্ত থেকেই আমাদের বোঝা উচিত। কেন্দ্রে দীর্ঘদিন একটানা দুর্বল কংগ্রেস সরকার থাকার ফলে তারা ক্রমশই দুর্নীতিগ্রস্ত হতে থাকে। এই সরকারের সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারীই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে এই সরকার এমনিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্যগুলি এই সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একটু একটু করে ভারতীয় ভূখণ্ড গ্রাস করবার চেষ্টা করছে। আর এই সরকারের কী অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ব্যাপারেই ঔদাসীন্য আজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—পাঁচুগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রপুর, হাওড়া।

অশান্ত অসম : কিছু কথা

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্প্রতি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা অসমের ঘটনাবলী নিয়ে নানা অসঙ্গতিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে। তাই তার উপর আলোকপাত করা অত্যন্ত জরুরি মনে করছি। দেশ ভাগ হওয়ার আগে থেকেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম লীগ সরকার একটা স্লোগান প্রচার করেছিল—‘উপরে আছে খোদাতাল্লা নীচে আছে সাদুল্লা (অসমের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী), চল অসম ভাই ও শালা (Brother and Brother in low)’। তখন দলে দলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা অসম গিয়ে বিনা বাধায় সরকারি এবং বেসরকারি জমি জবরদখল করে চাষাবাদ এবং বনের গাছ কেটে কাঠ চোরাচালান করে জীবিকা নির্বাহ করে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে স্থানীয় মহিলাদেরকে বিবাহ করে ‘ইসলাম চাষাবাদ’। দেশভাগের পরেও পূর্বপাকিস্তান থেকে অসমে মুসলমান অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকে। তাতে পূর্বপাকিস্তান সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। কারণ অসমের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খনিজ সম্পদ নিজেদের দখলে নেওয়ার জন্য মুজিবর রহমান এবং ভুট্টো যে সব চিঠিপত্র চালাচালি করে তার কপি আমার সংগ্রহে আছে, বর্তমানে অসমে ১২টা জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১২২ জন এম এল এ-র মধ্যে ৪৫ জন মুসলমান এম এল এ। যে দলই সরকার গড়ুক তার চাবিকাঠি মুসলমানদের হাতে। যাদের নেতা বদরউদ্দীন আজমল যার দুবাইতে প্রচুর ব্যবসা আছে। সাম্প্রতিককালের আর একটা ঘটনা হলো চীন তিব্বতের দিকে পাহাড়েও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রচুর জল তাদের দিকে প্রবাহিত করে নিচ্ছে। ফলে ব্রহ্মপুত্র এবং শাখা নদীগুলিতে প্রচুর চর সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব জমি প্রচুর ফসল উৎপন্নকারী হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানরা এসে বিনা বাধায় বসবাস আরম্ভ করে। এদের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় বাসিন্দাদের জমি দখল করা, মেয়ে অপহরণ, ধর্ষণ, চুরি ডাকাতি ইত্যাদি। এছাড়াও রাজমিস্ত্রী, রিক্সাটানা, দর্জির কাজ, মাংসের দোকান, দিন মজুরের কাজকর্মও তারা করছে। গত মে (২০১২) মাসে একটি সমাজসেবী সংস্থার কর্মী হিসাবে উত্তরবঙ্গ ঘুরতে গিয়ে এটা দেখেছি। অসংখ্য বাংলাদেশী মুসলমান সরকারি জমি দখল করে বিশেষ করে রেললাইনের দু'ধারে কলোনী তৈরি করে কিছু কিছু মাদ্রাসা তৈরি করে স্থানীয় মেয়েদেরকে ফুঁসলে বিয়ে করে ব্যাপকহারে ইসলাম চাষাবাদ আরম্ভ করেছে। এমনকি তারা চা বাগানের জমি দখল করে পাকা বাড়ি ঘর তৈরি করে বসবাস পর্যন্ত করছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বিকার। গত ১-৩-২০১২ থেকে ৩১-৫-২০১২ এই তিন মাসে কোচবিহার, মেখলিগঞ্জ, দীনহাটা, মাথাভাঙ্গা ও তুফানগঞ্জ থেকে ৩১৮ জন নারী নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ থানায় জমা পড়েছে। এই অন্যায় অবিচার ধামাচাপা দিতে প্রশাসন গল্প তৈরি করেছে যে স্বামীরা না থাকার সুবাদে বৌ ফুঁসলে নিয়ে গিয়ে পাচার করে দেওয়া হয়েছে (তথ্য সূত্র : মানবকণ্ঠ (Manab Kantha) পত্রিকা ৫-৭-১২)। অসম অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে রেওয়াজ হলো কোনও মেয়ে একবার ঘর ছেড়ে বিধর্মীদের সঙ্গে চলে গেলে তারা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেনি বা সমাজ তাকে গ্রহণ করে না। অসমের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষাপট হলো বাংলাদেশী মুসলমানরা জনৈকা বোড়ো যুবতীকে ধর্ষণ করে হত্যা করার পর বোড়োরা দুইজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশী মুসলমানকে হত্যা করে। মুসলমানরা তার বদলা হিসাবে ৪ জন বোড়ো যুবককে হত্যা করে এবং অনেক বোড়ো গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। যার ফলস্বরূপ সরকারি হিসাব মতো প্রায় ৪ লক্ষ লোক গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে অবস্থান করতে বাধ্য হয়। মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবমতো ৮৭ জন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ বর্তমানে বোড়ো টেরিটোরিয়াল অঞ্চলে বোড়োরা ৩৩ শতাংশ এবং অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠী ৬৭ শতাংশ। বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদেরকে অসমিয়া মুসলমান বলে ভোটার লিস্টে নাম তুলে কংগ্রেস তাদের ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করে চলেছে। বাংলাদেশীদের হাতে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র থাকার ফলে বোড়োরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দাঙ্গার ফলে কিছু বাংলাদেশী মুসলমান উত্তরবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এরা আমাদের মেহমান (অতিথি) যত দিন ইচ্ছা তারা এখানে থাকতে পারবে। তাদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব সরকারের। এর মধ্যে কলকাতার কয়েকটি মুসলিম অঞ্চলে মাইক বাজিয়ে সভা করে বলা হয়েছে এদেরকে নাগরিকত্ব দিতে হবে, অসমে মুসলমানরা আক্রান্ত বলে মিথ্যা প্রচার করে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকদেরকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ভারতের কে কোথায় চাকুরী করবে, লেখাপড়া শিখবে তা নির্ধারণ করবে মুসলমানরা! উল্লেখ্য যে, কোকরাঝাড় থেকে বাঙালি মুলসলমান ইউসুফ মোমিন আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যশোডাঙার এক শিবিরে, তার কথায় “আমার আট ছেলে চার মেয়ের ঘরে ৭৫ জন সদস্য (নাতি-নাতনী)। সকলের আশ্রয়স্থল এই এক শিবির।”

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে ৈর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন,
বোলপুর ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

পৌরাণিক নগর কেকয়

গোপাল চক্রবর্তী

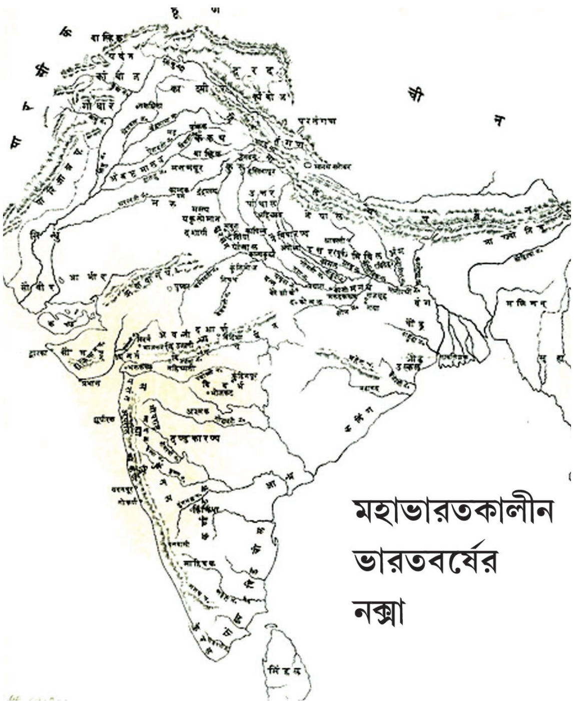

মহাভারতকালীন ভারতবর্ষের নক্সা

কেকয় বৈদিক যুগের একটি শক্তিশালী রাজ্য। শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেকয় রাজ্য ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবে। গান্ধার এবং তিস্তা নদীর মধ্যস্থলে ছিল এই অঞ্চল। রামায়ণ অনুসারে কেকয় অঞ্চল বিপাশা বা বিতস্তা নদীর তীরে গন্ধর্ব বা গান্ধারের সীমানায় অবস্থিত ছিল। মহাভারত কেকয়দের মদ্রদের সহযোগী হিসাবে বর্ণনা করেছে— ‘‘মদ্রাশ্চ সহ কেকয়ৈঃ’’

Arrian কেকয়দের, সরনগেস (Saranges) যা হাইড্রওটেস (Hydraotes) বা রাবির শাখা নদী, তার কুলে বসবাসকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

বৈদিক সাহিত্যে এর রাজধানীর কোনও উল্লেখ নেই। রামায়ণের মতে এর রাজধানী ছিল ‘রাজগৃহ’ বা ‘গিরিব্রজ’। কেকয় রাজারা অনেক সময় অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করতেন। অযোধ্যার রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী ছিলেন কেকয় রাজ অশ্বপতির কন্যা। কৈকেয়ীর ভ্রাতাও অশ্বপতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রামায়ণের কাহিনী অনুসারে যখন রামচন্দ্র কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূরণ এবং পিতা দশরথের সত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন শোকে পিতা দশরথের মৃত্যু হয়। ভরত-শত্রুঘ্ন ছিলেন তখন রাজগৃহে মাতুলালয়ে।

‘‘উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ কেকয়েষু পরন্তপৌ
পুরে রাজগৃহে রম্যে মাতামহ নিবেশনে।’’

—‘অর্থাৎ শত্রুদমনকারী ভরত এবং শত্রুঘ্ন দুজনেই কেকয়দের মনোরম নগর রাজগৃহে ছিলেন। এই রাজগৃহ ছিল ভরতের মাতামহের আবাস।’

তাঁদেরকে নিয়ে আসার জন্য অযোধ্যার দূত ছুটল।

‘‘গিরিব্রজং পুরববংশী শীঘ্রং আসেদুরঞ্জস্য।’’

‘‘(কৈকেয়ের পথে দূতেরা) তাড়াতাড়িই সর্বোত্তম নগর গিরিব্রজে উপস্থিত হয়।’’

অযোধ্যা থেকে কেকয়দের রাজধানীর দূরত্ব ছিল ৬৫০ মাইল, যেতে সাতদিন সময় লেগেছিল। Pargter এই ধীর গতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে ভালো রাস্তার অভাবই এর কারণ। Cunninghum কেকয়দের রাজধানীকে ঝিলমনদীর তীরে গিরিজক বা জললপুরের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন।

মগধে রাজগৃহ-গিরিব্রজনামে আরও একটি স্থান ছিল। হিউয়েন সাঙের বৃত্তান্তে তৃতীয় এক রাজগৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন এই তৃতীয় রাজগৃহ পো-হো বা বল্‌খ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কেকয়দের নগর এবং মগধের রাজধানীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য মগধের রাজধানীকে বলা হোত— ‘মগধবাসীদের গিরিব্রজ।’

পুরাণ অনুসারে কেকয়, মদ্র এবং উশীনরের ছিল যযাতির পুত্র অনুর বংশের শাখা। ঋগবেদে ‘অণু’ গোষ্ঠীর বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটি সুক্ত থেকে জানা যায় যে তারা যে অঞ্চলে বাস করত পরবর্তীকালে সেই অঞ্চল কেকয় ও মদ্রদের অধিকারভুক্ত হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ অনুসারে এক মহাপণ্ডিত এক সময়ে কেকয়েদের রাজা ছিলেন। তিনি অরুণ ঔপবেশি, গৌতম, সত্যযজ্ঞ পৌলশি, মহাশাল জাবাল, বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, জন শার্করাক্ষ্য, প্রাচীনশাল ঔপমন্যব এবং উদ্দালক আরুণি প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অরুণ ঔপবেশি উদ্দালকের অনেক পূর্বের লোক। সুতরাং এই প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখ প্রমাণ করে যে তিনি দার্শনিক রাজা জনকের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক।

জৈন লেখকরা বলেন— কেকয় রাজ্যের একটা অংশ ছিল আর্য। এই প্রসঙ্গে তাঁরা কেকয় নগর ‘সেয়বিয়া’র (Seyaviya) উল্লেখ করেছেন। কেকয়দের একটা শাখা সম্ভবত দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে মহীশূর অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। The History and Culture of the Indian People-- R.C. Majumder. ২। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস— ড. হেরম্বচন্দ্র রায়চৌধুরী। ৩। ভারতকোষ— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

দুর্গা পূজায় শস্য আরাধনা

মেঘদূত ভুঁই

মাতৃকাদেবীর পূজার সূচনা হয় নবোপলীয় যুগে শস্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে। ধান চাষকে কেন্দ্র করে বাংলায় নবোপলীয় যুগে বিপ্লবের ঢেউ দেখা দেয়। শস্যাদির সঙ্গে যে মাতৃকাশক্তির পূজা সংশ্লিষ্ট ছিল তা প্রকাশ পায় হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর নিদর্শনে। প্রস্তরে খোদিত নিম্নাভিমুখী এক নারী মূর্তি, যার বিস্ফারিত যোনিদেশ থেকে পল্লবিত হয়েছে বৃক্ষচারা। জন মার্শাল সাহেব এলাহাবাদের কাছে ভিটা গ্রামে পোড়ামাটির সিলমোহরে অনুরূপ নারী মূর্তি আবিষ্কার করেন কিন্তু তার যোনির বদলে কাঁধ থেকে সনাল-পদ্ম উদ্‌গত হয়েছে।

প্রস্তর যুগে মানুষ শস্য রোপণ, বপন, পরিচর্যা, সংরক্ষণ ও সুশস্যের কামনায় ঐন্দ্রজালিক নানা প্রক্রিয়ার উদভাবন ঘটিয়েছে। তার সঙ্গে আরাধনা করেছে ফসল সংক্রান্ত মাতৃকাশক্তির। উল্লিখিত দু'টি মূর্তিকেই শস্য ফসলাদির ধারিকা ও বাহিকা হিসাবে চিহ্নিত করলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্য খণ্ডে শস্যদেবী শাকম্ভরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে—

"ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহংভুবি।"

অর্থাৎ অতি বৃষ্টির সময় আমি আমার নিজের দেহ থেকে নির্গত প্রাণসঞ্জীবনী শস্য দিয়ে জগৎবাসীর লালন পালন করব। একারণে আমি বিশ্ববাসীর কাছে শাকম্ভরী নামে খ্যাত হব।

এই প্রসঙ্গে দুর্গাপূজার সঙ্গে শস্য আরাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কিনা অথবা শস্য আরাধনাই দুর্গাপূজার রূপান্তর কিনা তা সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করছি। আমরা জানি যে, বনদুর্গা, জয়দুর্গা নামে মাতৃকাশক্তি পূজিতা হতেন আদিমকালের মন্ত্রহীন-স্তোত্রহীন আদিবাসী মানুষের কল্পনাপ্রসূত ভয়-ভক্তি ও বাঁচার প্রতিশ্রুতিকল্পে। হয়তো দুর্গম বনের আরাধিতা দেবীই 'বনদুর্গা' নামে খ্যাত হয়েছেন দিনাতিক্রমে আদিম সমাজে।

শস্য বলতে এখানে শাক-সবজিকেও বুঝতে হবে। ফসলাদি শস্যের সঙ্গে দেবীদুর্গার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর। দেবীর নামের মধ্যেই অনুসন্ধিৎসু মনের অনেক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় অল্প আয়াসে।

ভক্তচিত্তে দেবী বহুরূপে জগন্মাতা, বহুনামে পূজিতা। কেবলমাত্র তিন-চারটি নাম ও আনুষঙ্গিক পূজা উপাচারের বিষয় বিশ্লেষণ করে শস্য উপাসনার জ্ঞান উপলব্ধি করা খুব কঠিন মনে হয় না। সেই নামগুলি হলো— শতাক্ষী, শাকম্ভরী, পর্ণশবরী, অপর্ণা, অন্নপূর্ণা ও অপরাজিতা। তাছাড়া 'নবপত্রিকার' উপস্থিতিতে আরও স্পষ্ট হয় যে, দেবীদুর্গা আদিতে শস্যদেবী হিসাবে মানুষের কাছে

পরম্পরা

পূজিতা ছিলেন। তবে সব শারদীয়া দুর্গামণ্ডপে নবপত্রিকা আনা হয় না। কোনও স্থানে আবার দেবীর কোনও মূর্তি, ঘট-পট কিচ্ছু নেই, কেবল কলাবউ পূজাতেই দেবী সন্তুষ্টা। যেমন— বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার পুয়াড়া গ্রামে চ্যাটার্জী পরিবারের দুর্গাপূজা।

শতাক্ষী : 'শতাক্ষী' কথার অর্থ হলো— শত অক্ষীর সমাহার বা বহু নয়না দেবী। দেবী ভাগবতে আছে যে, রুরু অসুরের পুত্র 'দুর্গম' কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বুঝলেন যে, বেদই হলো দেবতাদের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস। বেদানুযায়ী যাগযজ্ঞের ঘৃতাদি পান করেই দেবতাগণ বলীয়ান হয়েছেন। তাই তিনি বেদকে নিজের অধিকারে আনতে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করলেন। প্রথম বরে, দুর্গমাসুর বেদের অধিকারী হলেন। দ্বিতীয় বরে, তিনি দেবতাদের কাছে অপরাজিত থাকবেন। এদিকে ঘৃত পানের অভাবে দেবতাগণ দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ফলে দুর্গমাসুরের অত্যাচারে ও অনাচারে শতবর্ষ ব্যাপী অনাবৃষ্টি দেখা দিল। পৃথিবীর জীবকুল বিপন্ন হয়ে পড়ল। জীবকুল রক্ষার্থে মুনি-ঋষিগণ হিমালয়ের গুহায় দেবী আদ্যাশক্তির আরাধনায় মগ্ন হলেন, দেবতারাও দেবীকে প্রার্থনা মন্ত্রে আহ্বান জানালেন—

"সমুদ্দর মহেশানি সংকটাৎ পরমোত্থিতাৎ।
জীবনেন বিনাস্মাকং কথং স্যাৎ স্থিতিরম্বিকে।।
প্রসীদত্বং মহেশানি, প্রসীদ জগদম্বিকে।
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়িকে তে নমো নমঃ।।"

—দেবী ভাগবত

দেবী পরিতুষ্ট হয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন। চতুর্ভুজা এই দেবীর দু'টি ডান হাতের একটিতে বাণ, অন্যটিতে পদ্ম। বাম হাত দু'টিতে যথাক্রমে ধনুক, ফুল-ফল-পাতা এবং নানাবিধ শাক-সবজি। তাই দেবীকে শস্য-মাতৃকাশক্তি বলা মোটেই অযৌক্তিক নয়। তাঁর সর্বাঙ্গে বহু নেত্র। খরাক্লিষ্ট পৃথিবীর জীবকুলকে বাঁচাতে ওই অনন্ত নেত্ররাশি থেকে নয় দিন অবিরাম নেত্রবারি বর্ষণ করতে লাগলেন। শুকনো মাটি সরস হয়ে শস্য উৎপাদনের উপযুক্ত হলো। দেবীর গায়ের রঙ নীল, উন্নত করুণা পীযূষধারায় পূর্ণ বক্ষস্থল, শত-শত-অক্ষীপূর্ণা এই দেবীর নাম হলো শতাক্ষী।

শাকম্ভরী : 'শাকম্ভরী' শব্দটির মানে খুব সহজ। শাক দ্বারা আচ্ছাদিত (পরিধান বস্ত্র) দেবীই হলেন শাকম্ভরী। শতাক্ষীদেবীর নেত্রবারি সিঞ্চনে পৃথিবী রসবতী হলো। তাঁর হাতে রক্ষিত ফুল-ফলাদি, শাখা-প্রশাখা, বীজ ও মূল বর্ষণসিক্ত মাটিতে ফেলে দিয়ে, তার থেকে শাক-সবজি উৎপন্ন করলেন। সেই শাক-সবজি দিয়ে ক্ষুধাপীড়িত সন্তানদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করলেন। নিজ দেহ থেকে শাক-সবজিসহ ফসলাদি সৃষ্টি করে সন্তানদের পোষণ ও পরিতৃপ্ত করলেন বলে তাঁর নাম হলো শাকম্ভরী। দেবীর হাতে দশ রকমের শাক-সবজি ছিল। যথা— মূল, পটলপাতা, বাঁশফোড়, বেতের আগা, কুমড়া-লাউ, পদ্মের ভেতরের নাল, গাছের ভেতরের শাঁস, মাতুলুঙ্গাদি গাছের ছাল, নানা জাতের ফুল (যা ভক্ষণ যোগ্য) ও ব্যাঙের ছাতা (ছাতু)। শাক দিয়ে সকল প্রাণীকে ভরণ করেছিলেন বলে দেবী শাকম্ভরী নামে পূজিতা।

এই দেবী দুর্গমাসুরকে বধ করেছিলেন নিজ দেহ নির্গতা নানা শক্তি দ্বারা। কালী, তারা, যোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা ও গুহ্যকালী রূপে। এগার দিন যুদ্ধ করে দুর্গম নিহত হলেন। দেবতাগণ ভক্তিচিত্তে মায়ের স্তব করতে লাগলেন—

"জগৎ ভ্রমবিবর্ত্তৈক কারণে পরমেশ্বরী।

নম শাকম্ভরী শিবে নমস্তে শতলোচনে।।
সর্বোপনিষদ্যুদঘুষ্টে দুর্গমাসুর নাশিনি।
নমো মায়েশ্বরী শিবে পঞ্চকোশান্তর স্থিতে।।”

‘অর্থাৎ আপনিই জগতের বিবর্তনের একমাত্র কারণ, হে দেবী শিবেশকম্ভরী, হে শতলোচনা, আপনাকে বার-বার প্রণাম। নিখিল বিশ্বে আপনার মহিমা উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। আপনি দুর্গমাসুরকে বধ করেছেন। মায়ার অধিকারী আপনি। আপনাকে প্রণাম করি।’

পশ্চিমবঙ্গে শাকম্ভরী দেবীর পূজা হয় বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার মাজি গ্রামে। এখানে দেবী শাকম্ভরীর প্রস্তর মূর্তি আছে। দেবী চতুর্ভুজা, তাঁর হাতে রয়েছে— শঙ্খ, চক্র, তীর ও ধনুক। কালোপাথরে খোদিত, মূর্তির উচ্চতা প্রায় ১৫-১৬ ইঞ্চি। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই দেবীর মূর্তি দেখা যায় এবং পূজাও প্রচলিত আছে। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, রাজস্থানের আজমীর, মহারাষ্ট্রের নাগেনওয়াড়ি ও কুম্ভোজে দেবীর আরাধনা করা হয়। আয়ার্ল্যান্ডের কেল্ট-দেবতা ‘লুগ’-এর ধাত্রীমাতার নাম ‘টইলটিউ’। প্রকৃতপক্ষে তিনি শস্যরূপিণী মাতৃকাশক্তি। শরৎকালের প্রারম্ভে এই দেবীকে নিয়ে আয়ারল্যান্ডে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

পর্ণশবরী : আদিবাসী শবর জাতির পূজিতা মাতৃকা দেবীর নামই পর্ণশবরী। এই দেবীর পরিহিত বস্ত্র হলো শাল গাছের পাতা। আদিবাসী সমাজে অতীতকালে বনদুর্গা ও মিরাতিনী দেবীর আরাধনার রীতি প্রচলিত ছিল। জীমূতবাহনের ‘কালীবিবেক’ গ্রন্থে (দ্বাদশ শতক) এইসব দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ‘হরিবংশ’-এ দেবী অসভ্য শবর-বর্বর ও পুলিন্দ জাতি কর্তৃক পূজিতা হতেন বলে জানা যায়। বাকপতিরাজ ‘গৌড়বহোতে’ শবর দ্বারা পূজিত যে দেবীর কথা বলেছেন, তাঁর নাম পর্ণশবরী, তিনি পত্র পরিহিতা।

অপর্ণা : ‘হরিবংশ’-এ দেবী দুর্গাকে অপর্ণা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘অপর্ণা’ অর্থাৎ যে দেবী পত্র দ্বারাও আচ্ছাদিত নন। সুতরাং তিনি নগ্না। তাঁর দুই ভগ্নীর নাম একপর্ণা ও একপটলা। তাঁরা যথাক্রমে জইগিসব্য এবং অসিত দেবলের পত্নী ছিলেন। অন্যমতে দেবী শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। সে সময় তিনি গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করেননি। তাই তাঁর নাম হয় অপর্ণা।

অন্নপূর্ণা : আদিতে যে দেবী শস্যাদির সঙ্গে সংযুক্তা ছিলেন, তা তাঁর নাম থেকেই জানা যায়। অন্নপূর্ণা নামটি সংস্কৃত। কিন্তু আদিতে এই শব্দটির রূপ কি ছিল তা বলা কঠিন। তবে প্রাচীনকালে সুমেরের ‘এ-নান্না’ নামের দেবীর সঙ্গে অন্নপূর্ণার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। সুমেরের মাতৃকাদেবীর বাহন সিংহ এবং তাঁর পতির বাহন বলীবর্দ। উভয়দেশে এই মাতৃকাদেবী ‘কুমারী’ হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। এমনকি উভয় দেশেই দেবীর নারীসুলভ গুণ থাকলেও পুরুষোচিত কর্ম— যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে গেছেন।

অপরাজিতা : দুর্গার এক আবরণ দেবীর নাম অপরাজিতা। মহাবল পদ্ম নামে এক দৈত্যরাজকে পরাজিত করেছিলেন বলে দেবীর নাম হয় ‘বিজয়া’। আর তখন থেকে তিনি অপরাজিতা নামে খ্যাতা। অপরদিকে ‘অপরাজিতা’ হলো বিরুৎজাতীয় লতা গাছ। যার ফুল হলো নীল বর্ণের।, দুর্গাপূজায় অপরাজিতা ফুল ও লতা একান্ত প্রয়োজন। বিজয়া দশমীর দিন অপরাজিতা লতার তাগা ধারণ করার শাস্ত্রসম্মত বিধি রয়েছে। সকল বিপদকে জয় করার জন্য পুরুষগণ ওই তাগা ধারণ করেন। তাই দেবী দুর্গা অপরাজিতা গাছের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নবপত্রিকা ও বোধন : ষষ্ঠীর দিন বিল্ব বৃক্ষের তলায় দেবীর বোধন অনুষ্ঠিত হয়। মূলত প্রাচীন জনগোষ্ঠী বৃক্ষ ও প্রস্তর পূজায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই দুর্গাদেবীর বোধন অনুষ্ঠানটি প্রাচীন বৃক্ষ পূজারই দ্যোতনা। দুর্গাপূজায় যে নবপত্রিকা, থাকে আমরা কলাবউ বলি, এই কলাবউ বা গণেশের মা নয়টি বৃক্ষাংশের সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। এবিষয়ে রঘুনন্দন তার ‘দুর্গোৎসব’ তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন—

“কদলী দাড়িমী ধান্যঃ হরিদ্রা, মানকংকচুঃ
বিম্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ।”

অর্থাৎ কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, দাড়িম্ব, অশোক, বিল্ব, মান ও ধান এই নয় প্রকার ভেষজ বা বৃক্ষশাখা রয়েছে নবপত্রিকায়। নয়টি ভেষজ শস্যে দেবী বিরাজমান বলে দেবীকে ‘শস্যলক্ষ্মী’ (কৃষিলক্ষ্মী) রূপে পূজা করা হয়। ষষ্ঠীর দিন ছাড়াও সপ্তমীর প্রথম পূজাই তো নবপত্রিকার আরাধনা। দেবীকে সপরিবারে আহ্বান করা হয়।

“ওঁ ভূর্ভুব স্বর্ভগবতি দুর্গে স্বকীয় গণসহিতে
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ
ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব,
অত্রাধিষ্ঠানং কুরু-মম পূজাং গৃহাণ’।
....
ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবী অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবত সর্ব্বকল্যাণকারিণি।”

উল্লিখিত নয়টি শস্য বা বৃক্ষে দেবীর যে প্রতিকায়া বিরাজিত তা হলো— কদলীতে— ব্রহ্মাণী, কচুতে— কালিকা, হলুদে— দুর্গা, জয়ন্তীতে--- কার্তিকী, বিল্বে--- শিবা, ডালিমে--- রক্তদন্তিকা, অশোক--- শোকরহিতা, মানকচুতে আছেন চামুণ্ডা আর ধানে আছেন স্বয়ং লক্ষ্মী।

অনেক পুরাণে পৃথিবী মাতাকে পৌরাণিক মহাদেবী ও মহাশক্তি দুর্গার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। পূজাচারে নানাবিধ শস্যাদি ও বৃক্ষশাখার আয়োজন লক্ষ্য করলে পৃথিবীমাতার থেকে তাঁকে সম্পর্কচ্যুত করা যায় না। তাই শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে—

“আধারভূতা জগতস্তমেকা
মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।”

আর এই পৃথিবীমাতা থেকেই শস্যদেবী ও শস্যপূজার সৃষ্টি। শরৎকালে দুর্গাদেবীর যে বোধন তা তো শস্য দেবীরই পূজা। শরৎ হলো শস্যঋতুর প্রারম্ভকাল। আর বসন্ত হলো শস্য আরোহণের সময়। দুই প্রান্তেই দেবী দুর্গার আরাধনা প্রচলিত রয়েছে বাংলায়। তাই দুর্গাপূজার আর একনাম হলো শস্যপূজা। ইতি টানার আগে দেবীর কাছে প্রণাম জানাই এই বলে—

“সর্বরূপময়ীং দেবী, সর্বদেবীময়ং জগৎ
অতোহয়ংঃ বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম।”

গ্রন্থঋণ ও তথ্যঋণ :

১। শ্রীশ্রী দুর্গা তত্ত্বে ও কাহিনীতে। স্বামী অচ্যুতানন্দ

২। নানা রূপে নানা নামে জগন্মাতা। নিগূঢ়ানন্দ

৩। বঙ্গের শারদোৎসব ও ব্যতিক্রমী দুর্গাপূজা। শিবশংকর ঘোষ

৪। পৌরাণিকী পত্রিকা (মার্চ ২০১১)। সম্পাঃ ডঃ দীপক চন্দ্র

৫। ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। ডঃ অতুল সুর।

৬। দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, (গোপালপুর, বাঁকুড়া)

৭। ধীরেন্দ্রনাথ কর, বাঁকুড়া

হোতু-কোতু উপাখ্যান

গরিব ছেলেমেয়েদের মহালয়ার দিনে পোশাক দেওয়া

কোতুর ভাবভঙ্গি মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হলেও তাকে সরাতে রাজি নয় হোতু। কিছু কারণ আছে। আর প্রথমেই হোতুর একটা ভুল হয়েছে আবেগের বশে আর বিশ্বাস করে কোতুকে এমন কিছু কথা বলে ফেলেছে যা না বললেই ভালো ছিল। কোতু যে গোলমেলে ধরনের সেটা বুঝতে সময় লেগেছে। অনেক সময়ে কিছু অভিজ্ঞতার জন্যে বাড়তি মাশুল গুনতে হয়। হোতু এখন রীতিমতো সতর্ক। কোতুকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সে খুব কেউকেটো একজন। আসলে কোতু সবসময় ওইরকম ভাব নিয়ে থাকে। অনেক জায়গায় ঢোকে। নানান কৌশলে বিশ্বাস অর্জন করে। তারপর বেশ খানিকটা ক্ষতি করে সরে পড়ে। কোতু সম্পর্কে হোতু সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছে মনে মনে। পুরোপুরি সতর্ক নজর রাখবে এমনভাবে যাতে বুঝতে না পারে। কোতুকে কোনও কাজের ভার দিলে চিকলি আর শিট্টুকে সঙ্গে লাগিয়ে দেবে। তাছাড়া এখন দলে এসেছে ভনটু। সে কথা কম বলে। কিন্তু বাজপাখির মতো নজর রাখে। তার সঙ্গে কোতু ভাব জমানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুবিধে হয়নি।

প্রতিবছর পুজোর আগে হোতু গরিব ছেলেমেয়েদের পোশাক দেয়। আগে থেকে নাম ঠিকানা বয়স— এসব খোঁজ নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। খোঁজ নেওয়ার লোকজন আছে হোতুর। সে বলেছে বিনয়ের সঙ্গে, 'আমার পক্ষে সব গরিব ছেলেমেয়ের মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব নয়। কয়েকজনকে কিছুক্ষণ আনন্দ দিতে চেষ্টা করি।' কোতুকে ভার দিলে সে নিজের ঢাক পেটাবে আর ঠিকমতো পৌঁছে দেবে কিনা কে জানে। কোতুর বাবা মুরারী কয়েকবার ধরা পড়েছিল ত্রাণ-সামগ্রী বিলির বদলে সরানোর জন্যে। কিছু জিনিস বাজারে বিক্রি করে। আর বাছাই করা কিছু জিনিস নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। তার কোনও বাছবিচার ছিল না। আমদানির সুযোগ কোথাও আছে দেখলেই সে নড়েচড়ে বসত। বদমতলব মাথায় ঘুরত। বলাবলি করত চোরদের সেই পুরনো নীতিবাক্যটা : 'চুরি বিদ্যে বড়বিদ্যে/যদি না পড়ে ধরা।' ধরা কয়েকবার পড়লেও অনেকবারই পড়েনি। কোতু হলো সেই মুরারীর ছেলে। এই তথ্যটা হোতু জেনেছিল নাকুস-এর কাছে। নাকুস কোতুর পাশের পাড়ায় থাকে। নাকুস-এর দেওয়া খবর ভালোভাবে যাচাই করে নিয়েছে হোতু। অনেকরকম লোককে নিয়ে হোতুর কাজ। সেজন্যে কোতুর উপর নজর রাখলেও তাকে সরানোর কথা ভাবেনি।

একশোজন ছেলেমেয়েকে মহালয়ার দিন নতুন পোশাক দেওয়া হবে ঠিক হলো। ভনটু নাকুস চিকলি বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাম ঠিকানা বয়স তো জানলই, সেই সঙ্গে জানল কে কতটা লম্বা। কে রোগা কে মোটা। এছাড়া জুতোর জন্যে পায়ের মাপ নেওয়া হলো। হোতু ঠিক করে রেখেছে দরকার হলে আরও পঁচিশজন ছেলেমেয়েকে পোশাক দেওয়া হবে। সারা বছর ধরে ওই টাকা জমায়। প্রতিবছর খরচ বাড়ছে। পোশাক দেওয়ার সঙ্গে মিষ্টির প্যাকেট দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। বাজার থেকে ভালো জিনিস কেনার ব্যবস্থা হয়। দান করা হচ্ছে বলে যা খুশি দেওয়া হোতুর নীতি নয়। সে মনে করে, যেটুকু দেবো ভালো জিনিস এনে দেবো। খুব দামি নয়, আবার একেবারে খেলো নয়। পরলে ভালো লাগবে ছেলেমেয়েদের আর অন্যদের— এমন জিনিসই আনতে চায়।

কদিন ধরে বাজার হলো যত্ন করে। কোতুও খুব খেটেছে। প্রত্যেকের নামে দুটো প্যাকেট। একটাতে জামাপ্যান্ট। অন্যটাতে জুতো। মিষ্টির প্যাকেট মহালয়ার সকালে চলে আসবে। প্রত্যেকের প্যাকেটের সঙ্গে নাম ঠিকানা লেখা। একটা কার্ডও সঙ্গে রইল। তাতে লেখা : 'উৎসবের আনন্দ তোমাদের মন ভরিয়ে দিক। ভালো থেকো সবাই। হোতু।'

বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে, না সকলকে এক জায়গায় ডাকা হবে? এই নিয়ে একটু ভাবার পর ঠিক হলো একটা জায়গায় সকলে হাজির হয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা যাবে। হোতুর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আসতে রাজি কয়েকজন নামী মানুষ। কেউ রাজনীতির লোক নন। লেখক-গায়ক-চিত্রকর-শিক্ষক। অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটু গানটান হবে। মহালয়ার আগের দিন বিকেলে প্যান্ডেল হয়ে গেলো। সমস্ত আয়োজন ঠিকমতো এগোচ্ছে কিনা দেখে নিলো হোতু। শ্রদ্ধা আর শৃঙ্খলায় সব কাজ করার কথা বলা হলো সকলকে। মহালয়ার দিন ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র চণ্ডীপাঠ মন দিয়ে শোনে হোতু ছেলেবেলা থেকে। কোনও বছরেই বাদ যায় না। তারপর গঙ্গার ধারে একবার ঘুরে আসে। পোশাক দেওয়ার অনুষ্ঠান বিকেলে হবে ঠিক হওয়ায় হোতু গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। বছরের অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনটাকে মেলাতে পারে না। অনেকের কথা মনে পড়ছিল। সকলকে মনে মনে প্রণাম করল।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

ছোটোদের বই দিন

কদিন আগে একটা পোস্টার লিখছিল পৃথ্বীশ-স্যার। ছোটোদের নিয়ে তার কাজ। সবসময় মেতে থাকে। ছোটোরা তার বন্ধু। ছোটোদের অভিভাবকদের বেশি পাত্তা দেয় না। তারা

নিজের ছেলেমেয়ের নামে কোনও অভিযোগ করলে শোনে না। বলে, 'ওই বয়সে আপনি কি করতেন আপনার বাবা মায়ের কাছ থেকে লিখিয়ে আনুন। আমি ছোটোদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ শুনবো না।' অনেক অভিভাবক পছন্দ করে পৃথ্বীশ স্যারকে। অনেকে পছন্দ করে না। ছেলেমেয়েরা খুব ভালোবাসে তাদের স্যারকে। অনেকে বড়ো হয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসেছে স্যারের কাছে।

পোস্টারটা এক জায়গায় টাঙানো হবে। লেখা আছে, 'ছেলেবেলা হইতে বাংলা বই যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছি সমস্তই গিলিয়া পড়িয়াছি।' লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছোটোদের বই দিন। শ্রদ্ধায় দিন। স্নেহ ভালোবাসায় দিন। দেখবেন, ছোটোরা বই চায়। চায় নানারকম বই। তারাই রক্ষক গ্রন্থ-সংস্কৃতির।' পোস্টারটা পাড়ার লাইব্রেরিতে থাকবে। অনেকে দেখবে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার নয় রত্নের নাম?

২. বিক্রমাদিত্য কোন্ বংশের? কোন সময়ের? পুরো নাম?

৩. ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ কাকে বলা হয়?

৪. 'শকুন্তলা' কার লেখা?

৫. 'মৃচ্ছকটিক'-এর লেখক কে?

উত্তর : ১. ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। ২. গুপ্ত বংশের। ৩৮০-৪১৩ খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। ৩. পাণিনি। ৪. কালিদাস। ৫. শূদ্রক।

ছোটোদের বলছি

উলটো পালটা

সনোজ দত্তের খুব লোভ মিষ্টির উপর। এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক মিষ্টি এসেছিল। বাড়ির লোকজন যখন কাজে ব্যস্ত তখন সনোজ তার ছোট ছেলে নান্টুকে নিয়ে মিষ্টি খাওয়া শুরু করে দেয়। টপাটপ মিষ্টি খেতে থাকে। একটি ছেলে চুপিচুপি দেখে খবর দেয় বাড়ির কর্ত্রীকে। তিনি কিছু বললেন না। দুপুরে খাওয়ার সময় বললেন, 'আজ তোমাদের এক বালতি রসগোল্লা খাওয়াবো সকলের সামনে। তোমরা লুকিয়ে ভাঁড়ার থেকে যা খেয়েছিলে তার থেকে বেশি।' আর মিষ্টি খাওয়ার ক্ষমতা দুজনেরই ছিল না। সনোজ তার ছেলেকে নিয়ে সরে পড়ল ঝটপট।

।। ২।।

রাখহরি ব্যানার্জিরা তাল মিলিয়ে চলতে পটু। তাদের বাড়িতে নানা মতের ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক আছে। পছন্দও আলাদা আলাদা। ছাঁচে ঢালার কোনও চেষ্টা কখনও থাকেনি। তার দরুন সারা বছর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। বাড়ির ম্যানেজার গোছের মানুষ অজিত দাস। তিনি বাইরের ঝামেলার সামলানোর কথা ভেবে

বাড়িতে সব দলের পতাকা রেখেছেন। প্যাকেট করা থাকে। বাড়ির কোনও কোনও কর্তা রাজনীতি করেন। বিভিন্ন দলে নাম লেখানো। অজিত পতাকা জোগান দেন। লাঠি একই। শুধু পতাকার রঙ বদলে যায়। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, এক দলের সমর্থকের কাছে অন্য দলের পতাকা পৌঁছে যায়। তখন সামাল দিতে হয়। পতাকা খুলে তা কোমরে বাঁধার পর শক্ত হাতে লাঠি ধরা থাকে। অজিতকে লাঠি আর পতাকা জমা দিতে হয় মিটিং শেষে। অন্য দলের পতাকা হলেও অবজ্ঞা করার উপায় নেই। অজিত বলেন, 'নিজেরা দেখে নিয়ে যাও না কেন? দলের পতাকা চেনো না ভালো করে। তোমরা আবার লোকের ভালো করবে!' সবাই চুপচাপ কথাগুলো হজম করে।

রামগরুড় সংকলিত

আগমন বৈচিত্র্য

বিদিশা ভট্টাচার্য

“দুর্গা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, সিংহবাহিনী,
শক্তিদায়িনী আগামনী সুর আকাশে-বাতাসে
সোনালী শরৎ উৎসবে হাসে।
মায়েরই গান,কলাবউ স্নান, বোধন তোমার আজও অম্বর! জাগো মা...জাগো মা...জাগো মা”— পেঁজা তুলোর মেঘের আনাগোনা জানান দিচ্ছে পুজো আসছে। শিউলিফুল ঢাকের বাদ্যি, শিশির ভেজা ঘাস, মোবাইলের রিংটোনে “বাজল তোমার আলোর বেণু, মাতল রে ভুবন” সব মিলিয়ে বাঙালী চিরপরিচিত উৎসব এখন দোরগোড়ায়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে গানটি মনে করিয়ে দেয় মা দুর্গার আগমন বার্তার কথা। পুজো মানেই মা উমার আগমনে মত্ত হয়ে ওঠে জগৎবাসী। কিন্তু বর্তমানে কী আগমন হয়? নাকি আগমনের প্রস্তুতিতেই সময় চলে যায়। কৈলাস থেকে উমা যখন মর্ত্যে আসে সেভাবে এবার তাকে কোন্ রূপে, কোন্ প্যান্ডেলে অধিষ্ঠিত হতে হবে? মানে কোন্ থিমে তাকে সাজানো হবে। এই প্রশ্নটি বড় হয়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের মনে। জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এখন শুধু সাজো সাজো রব।

মা দুর্গার আগমন-এ প্রস্তুতি নিয়ে পরিকল্পনার অন্ত নেই। শুধু নগরজীবন নয়। শহরতলিতেও এর প্রভাব বিশাল বড় মাত্রায়। কখনও থিম্ বৃটিশ আমলের বিকানিরের লক্ষ্মীনিবাস প্যালেস। কখনও আবার মা-ঠাকুমার শাড়ীর চওড়া পাড়ে তৈরি হচ্ছে স্ফটিকের থিম মণ্ডপ। কখনও আবার থিম ‘নিপীড়িত নারীশক্তি’। নারীশক্তিকে সম্মান জানাতেই এই প্রয়াস, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, নারীপাচার- এর মতো নারকীয় ঘটনা নারীশক্তিকে এখনও অপমান করে চলেছে, যাঁরা পৃথিবীর আলো দেখান সেই মাতৃশক্তিকে সম্মান জানানোর এর থেকে ভাল উপায় আর কী কিছু হয়? সত্যিই! সহজে কর্ম সমাপনের পদ্ধতি এই সমাজের মানুষগুলোর থেকে আর কেই বা ভাল পারে!

অর্থাৎ এখনও অনেক পরিবার আছে যারা হয়তো কন্যা সন্তান জন্মালে শাঁখ বাজানোতো দূরে, মুখদর্শনও করে না। কিন্তু তারাই আবার মা দুর্গার পূজায় সামিল হয়ে ভক্তির চূড়ান্ত রূপ প্রদর্শন করে। কন্যা সন্তান কী এতটাই তাচ্ছিল্য? এতটাই অপাংক্তেয় সেও তো মা দুর্গারই এক অঙ্গ। কত নারী আছে যাদের কন্যাভ্রূণ হত্যা করানো হয়, কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে ভয়ে থাকে এই বোধহয় শুধু দু’বেলা দু’মুঠো অন্ন গ্রাস করতে হবে গঞ্জনা আর অপমানের সহযোগে। শাশুড়ী-স্বামীর অত্যাচার এতো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

কিন্তু এই নারীকেই পুজো করা হয় মাতৃরূপে, খরচ করে প্যান্ডেলে অধিষ্ঠিতা করানো হয়। নারী জাতি ধ্বংস হয়ে গেলে কুমারী পুজো কী সম্ভব? সন্ধিপুজোর জোগাড়ে ১০৮টি পদ্ম ফুল কে ফোটাবে? কেই-বা উপবাস করে পরিবারের মঙ্গলের জন্য নির্জলা থাকবে? কেই-বা সন্ধ্যারতিতে প্রদীপ প্রজ্জলনে হাতে আগুনের তাপ নেবে? কেই-বা নেবে মা দুর্গার বিদায়ের কনকাঞ্জলি? দশমীর বরণেও এই নারীর প্রয়োজন। তখনতো নারী ছাড়া অসম্ভব। তাহলে কেন এই অশ্রদ্ধা নারী জাতিকে? যেসব উদ্যোক্তা দিনরাত্তির চিন্তায় কাটাচ্ছে মা দুর্গার আবাহনের থিম নিয়ে, তাদেরই বাড়িতে মেয়ে জন্মালে মনটা হয়ে যায় যেন মেঘলা আকাশের মতো, মিষ্টিমুখও কাউকে করায় না, কারণ এতো লজ্জার ব্যাপার, সত্যিই কি এতটা লজ্জার? নারীরা ললনা, তন্বী কতই উপমা পায়, তাকে নিয়েই কবিতা, সাহিত্যে কত কী লেখা হয়, যে নারীকে এত অবহেলা সেই নারীর পুজোই আজ উৎসবে পর্যবসিত।

দেবগণ আর অসুরগণের যুদ্ধে জয় হয়েছিল এক নারীশক্তির। এখনও চলছে সেই লড়াই। একদিন এই তমসা কাটবে নারী সেজে উঠবে নবরূপে— কপালে থাকবে জয়ের টীকা, খোলা চুলের বর্ণচ্ছটা, চোখ থেকে ঠিকরে বেরবে আগুন, শরীরে থাকবে সেই শক্তি, হাতে খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা— গোটা প্রকৃতি আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র থেকে বেজে উঠবে অট্টহাসি, আর শোনা যাবে সেই মন্ত্রোচ্চারণ—

“জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা
শিবা ক্ষমদাত্রী স্বাহা সদা নমহস্তুতে।
নমহস্তুতে! নমহস্তুতে!”

ধ্বংস হবে সেইসব বিচ্ছেদ---ভেদা-ভেদ।

কিন্তু এরও কী প্রয়োজন আছে। নারীরা হত্যার জিনিস নয়। যখন সংসারে একটি মেয়ে আসবে তাকেও বরণ করে নেওয়া উচিত। তারও মধ্যে আছে মাতৃভাব। নারীরা চায় একটু শ্রদ্ধা, একটু সম্মান, যা তাদের করুণ নয়নের আকুতিতে ভরে ওঠে। আমি বাঁচতে চাই... আমায় বাঁচতে দাও, তারা চায় না খ্যাতি যশ— শুধু একটি কন্যা শিশু যখন পৃথিবীর আলো দেখতে পায়, তাকেও যেন বরণ করে ঘরে তোলা হয়। দশমীর বিসর্জনের ঢাক নাই বাজানো হলো। ক্ষতি কী? করুণ চোখের দৃষ্টিগুলো বারবার বলে ওঠে—

“তবু মনে রেখো!”

জুতা মেরেছে, কিন্তু অপমান করেনি !

শিবাজী গুপ্ত

> **প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালতের ভৎর্সনা ও কটাক্ষের পর দল ও সরকারের ট্যাঁড়াদার কপিল সিব্বল, দিগ্বিজয় সিং, অভিষেক সিংভী তড়িঘড়ি সাংবাদিকদের ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন আদালতের তিরস্কার প্রধানমন্ত্রীর গায়ে লাগবে না বা ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সনের উপর বর্তাবে না।**

ইউ পি এ-টু সরকার যে দো-নম্বরি সরকার তা তার নামকরণ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়! এই সরকারের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনেই দো-নম্বরি কীর্তিকলাপ ধরা পড়ছে। একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে সরকারের হোমরা-চোমরারা জড়িত হয়ে পড়ছে। Scam এবং Scandal —এই সরকারের অঙ্গের অলঙ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার জন্য আইন আদালতে সরকার তিরস্কৃত ভৎর্সিতও হচ্ছে। সরকার পরিচালকদের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে এবং প্রশাসনিক স্তরে যথেষ্ট সততা ও স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে, সরকার ও দলীয় নেতাদের নৈতিক স্খলন ঘটেছে বলে আদালত বারে বারে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালতের ভৎর্সনা ও কটাক্ষের পর দল ও সরকারের ট্যাঁড়াদার কপিল সিব্বল, দিগ্বিজয় সিং, অভিষেক সিংভী তড়িঘড়ি সাংবাদিকদের ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন আদালতের তিরস্কার প্রধানমন্ত্রীর গায়ে লাগবে না বা ইউ পি এ-র চেয়ারপার্সনের উপর বর্তাবে না। আদালতে বিরূপ মন্তব্যে তাদের মর্যাদাহানি ঘটবে না, তাদের পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে একটি সত্যি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। এক দুষ্ট প্রজাকে সায়েস্তা করতে পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়ে জমিদার বাড়িতে ধরে আনা হলো। সেখানে তার উপর যথেষ্ট রকম উত্তম-মধ্যম ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হলো। কিল, চড়, লাথি, জুতা, কানমলা, নাকখৎ, লাঠিপেটা, জুতো পেটা, ঝাঁটার বাড়ি মারা— কিছু বাকি রাখেনি। এসব দৈহিক নির্যাতনের পরেও সে যদি তার স্বভাব না পাল্টায়, তবে তার কপালে আরও হেনস্থা ভোগ ও লাঞ্ছনা আছে বলে তাকে সাবধান করে ছেড়ে দিল। এবং ভবিষ্যতে বেয়াদপি করলে তাকে আরও অপমানিত হতে হবে বলে সতর্ক করে দিল। লোকটি গায়ের ধূলাবালি ঝেড়ে গ্রামে ফিরে এলে সবাই তার কাছে জানতে চাইল জমিদার বাড়িতে সে কেমন অভ্যর্থনা পেয়েছে। সে বুক ফুলিয়ে বলল— তাকে লাথি, জুতা, চড়, চাপড়, জুতা-ঝাঁটা সবই মেরেছে, কিন্তু অপমান করেনি।

কংগ্রেসের ট্যাঁড়াদারদের আচরণও সেরূপ। আদালত তাদের নেতা-নেত্রীর উপর যতই তীব্র কটাক্ষ করুক, তাদের শাসনব্যবস্থার উপর যতই বিরূপ সমালোচনা করুক, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং আর্থিক লেনদেনে অস্বচ্ছতার প্রতি সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করুক, তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁদের জোচ্চোর, তোলাবাজ, উৎকোচসেবী, কমিশনখোর, গাঁটকাটা পকেটমার যাই বলুক সেগুলি তো তাঁদের গলায় কলঙ্কের হার। মুখে এসব কথা বললেও, তাঁদের তো অপমান করেনি! তাঁরা জনগণের সেবা থেকে বিরত হবেন কোন্ দুঃখে? জনগণ আমাদের দিকে জুতো ছুঁড়ুক আর গায়ে থুথু ছিটোক, কোর্ট-কাছারী আমাদের নিন্দা- মন্দ করুক তাতে কি আসে যায়, অপমান তো করেনি!

কথায় বলে, মানীর অপমান বজ্রাঘাততুল্য। কিন্তু যারা মান-অপমানের তফাত বোঝে না তারা তো মহাপুরুষ! তারা বিষ্ঠা ও চন্দনে সমজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তা না হলে কি কেউ বলতে পারে যে জুতা মেরেছে বটে, কিন্তু অপমান তো করেনি?

নেত্রদান মহাদান

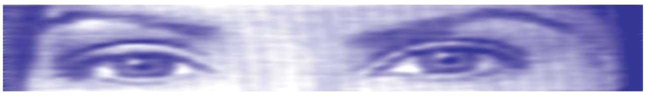

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

অতিথি কলম

এম ভি কামাথ

রাজনৈতিক মানসিকতার খোলনলচে পাল্টাতে হবে

লালকৃষ্ণ আদবানী চলতি সরকারকে অবৈধ বলায় বিস্তর নফর সংকীর্তনের বন্যা বয়ে গেল। অবশ্য আদবানীই আইনগত ও প্রথাসঙ্গতভাবে কথাটি কিছুটা বেঠিক বলেছিলেন। তাই প্রবীণ রাজনীতিক হিসেবে লোকসভায় ভুল স্বীকার করে নিতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত পরিস্থিতিটা কী? সত্যি কথা বলতে গেলে বলতেই হবে ইউপিএ-টু সরকার কংগ্রেস দল মোটেই

চালাচ্ছে না, এটি চালাচ্ছে 'সোনিয়া কংগ্রেস' নামে একটি পারিবারিক দল। বছরের পর বছর ধরে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই সোনিয়া গান্ধীর দলের একচ্ছত্র সভাপতি থেকে যাওয়ার ব্যাপারটা ভাবলেই কংগ্রেস যে দল হিসেবে আজ কত অন্তঃসারশূন্য সেটা বোঝা যায়। অতীতে কিন্তু এমনটা ছিল না।

কংগ্রেসী অতীত :

কংগ্রেসে বছর শালিয়ানা দলের সভাপতি বদল হোত। এটিই ছিল একরকম নিয়ম। কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ঘটত। ইউ এন ধেবর ১৯৫৫-৫৯ সাল পর্যন্ত দলের সভাপতি ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বছর তার পদ নবীকরণ হোত। নীলম সঞ্জীব রেড্ডী (১৯৬০-৬৩) পরপর চারবার নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৬৪-১৯৭৭ কামরাজও প্রতিবারই নির্বাচনের মাধ্যমে পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৭৮ সালে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সভাপতি পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা সবই কেমন একবগ্গা হয়ে পড়ল। শেষ হয়ে গেল নিজলিঙ্গাপ্পা, জগজীবন রাম, শঙ্করদয়াল শর্মাদের যুগ।

শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস সভাপতির ব্যাটন বহন করেছিলেন। ১৯৭৮ থেকে আমৃত্যু। সেটি পরে পরেই অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী গেল তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীবের হাতে। সেই আমৃত্যুর ধারা বজায় রেখে তিনিও ১৯৮৫ থেকে '৯১ দলে সভাপতির পদ ধরে রাখলেন। হ্যাঁ, অকালমৃত্যু না ঘটলে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় তিনিও স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত পদটি বয়ে বেড়াতেন। এর মধ্যবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিক পারিবারিক শূন্যতা হেতু সভাপতির পদটি '৯২-'৯৬ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নরসিংহ রাওয়ের হাতে যায়। নরসিংহ-র মৃত্যুতে শূন্যপদটি সীতারাম কেশরীর ওপর বর্তালেও তিনি চরম অপদার্থ বলেই নিজেকে প্রমাণ করেন। আর অপেক্ষা না করে চিরাচরিত প্রথা মেনে দল স্বচ্ছন্দে পরিবারের দিকে ঢলে পড়ে। আসেন সোনিয়া। দেশবাসী তারই ফলভোগ করছে।

এখন দেশের মানুষের সঙ্গে যে সোনিয়া গান্ধীর কোনও নাড়ীর টান নেই, তার জন্য সব দোষ তাঁকে কিন্তু দেওয়া ঠিক নয়। কংগ্রেস দল থেকে তো কেউ তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাননি। প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের হাত-পা বাঁধা। তিনি বোধহয় বন্দীদশাই উপভোগ করেন। কেননা তাঁর মুখ থেকে তো কিছুই শোনা যায় না। কংগ্রেসের সঙ্গে তার সহযোগী দলগুলির কোনও পারস্পরিক বিশ্বাস নেই। শরদ পাওয়ারের এন সি পি-র সঙ্গে দলের নিরন্তর ঝগড়াঝাঁটি চলছে। মওকা পেলেই ডি এম কে আস্ফালন করছে। টি এম সি তো হেলায় ফেলে চলে গেল। দেখেশুনে মনে হয় সরকার কি আদৌ চলছে!

মনমোহনের পরিতাপ :

২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে ডঃ মনমোহনের একটি উক্তি মনে পড়ছে। সেই সময় 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি আক্ষেপ করে বলেন, নিশ্চিত কোনও দৈবদুর্ঘটনার ফলেই তিনি রাজনীতিতে এসে পড়েছেন। ভারতের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার মতো যোগ্যতা তাঁর নেই। এ কাজের মধ্যে অনেক জটিলতা রয়েছে। তিনি কি ওই চেয়ারে বসার পক্ষে নিজেকে আদর্শ মানুষ বলে মনে করেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে মনমোহন বলেন "এই পদের জন্য শুধু শিক্ষাগত বা প্রযুক্তিগত দক্ষতার চেয়ে দেশের জটিল রাজনীতিকে সামাল দেওয়ার মতো কুশলতা থাকা দরকার।" পরিস্থিতি সাপেক্ষে দেখাই যাচ্ছে তিনি সে পদের উপযুক্ত নন। সঞ্চালকের আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কংগ্রেস দলের মধ্যেই তাঁর থেকে

অনেক বেশি উপযুক্ত প্রার্থী রয়েছেন। এমনকি সর্বসম্মতপ্রার্থী হিসেবে হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই আজ তাঁর অতীত আশঙ্কা সত্য হয়ে উঠছে বলে মনে হয় না কি?

চলতি পরিস্থিতি :

সম্প্রতি আমেরিকার একটি সাপ্তাহিক তাঁকে সাফল্যে খামতি থাকা রাষ্ট্রনেতাদের দলে ফেলেছে। এটা নিশ্চয় বিজেপি-র কথায় নয়। এই ফাঁকে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদকে (এন এ সি)-কে চাগিয়ে তুলে সোনিয়া তাঁর মাধ্যমে নিজের সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টায় নেমেছেন। যে কাজ সম্পূর্ণ অনৈতিক। এই প্রসঙ্গে 'ইকনমিক টাইমস' ২৪ আগস্ট সি পি ভাস্বরীর একটি লেখা প্রকাশ করেছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ লেখাটিতে ভাস্বরী প্রমাণ পেশ করে বলেছেন, সোনিয়া শুধু এককভাবে দল পরিচালনা করে ক্ষান্ত না থেকে সরকার পরিচালনাও তাঁর হাতে তুলে নিয়েছেন। মনমোহন তল্পিবাহকের মতো কাজ করে যাচ্ছেন মাত্র। এই মর্মে ন্যাকের চেয়ারম্যান হিসেবে ভাস্বরী প্রধানমন্ত্রীকে লেখা সোনিয়ার ২৫টি ও বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের লেখা ১৭টি চিঠির উল্লেখ করেছেন। এগুলি গত ৮ বছরে নানান বিষয়ে লেখা। তাঁর মতে এমন কাজ সমর্থযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি অতীতে বৃটেনের শ্রমিক দলের প্রধান প্রবাদপ্রতীম অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির উদাহরণ সামনে এনেছেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলেরই প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলীকে তাঁর নীতির রূপরেখা দিয়ে ল্যাস্কি সেই পথেই সরকার পরিচালনা করার অনুরোধ জানান। প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে এ্যাটলী জানিয়েছিলেন, সরকার তার কাজের জন্য শুধু আইন সভার কাছেই দায়বদ্ধ অন্য কোথাও নয়। তাই ল্যাস্কি দলের সমস্যায় আত্মনিয়োগ করলেই ভাল করবেন। আমাদের দেশেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর দলীয় সভাপতি জে বি কৃপালনীর মতো ব্যক্তিত্বকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ করার বা পরিচালনা করার কোনও বিশেষ ক্ষমতা দলীয় সভাপতির নেই। প্রধানমন্ত্রীই সংবিধানসিদ্ধ সরকারের প্রধান। নেহেরুর সঙ্গে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের একই রকমের সংঘাতের ফলে ট্যান্ডন পদত্যাগ করেছিলেন। আমাদের মনমোহন না এ্যাটলী, না নেহেরু, তিনি পক্ষান্তরে শুধু প্রভুর কাছ থেকে আদেশ নিতেই অভ্যস্ত। এখানেই প্রধানমন্ত্রীর অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে যায়। তথ্যগতভাবে একথা ঠিকই যে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার নির্মাণের স্থপতির নাম অবশ্যই সোনিয়া গান্ধী। কিন্তু বাস্তবে তো এটি জোট সরকার। তাই প্রধানমন্ত্রীকেই তো অন্যান্য জোট শরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামত নিতে হবে। না হলে তাঁর আর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এইভাবে খাতায় কলমে সাংবিধানিক ক্ষমতা আর অধিকারহীন ক্ষমতার খেলা তো আমরা ২০০৪-২০১২ অবধি দেখে চলেছি। হায়! সম্প্রতি কী অবলীলায় জোটের শরিকেরা প্রধানমন্ত্রীকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক করেছিল। ক্ষমতা দু' জায়গায় ফেরী হতে হতে এমন একটা সময় আমরা প্রত্যক্ষ করছি যখন সোনিয়াও আর জোট সহযোগীদের নিজের ইচ্ছাধীন রাখতে পারছেন না। তাহলে তাঁরই বা প্রয়োজনীয়তাটা কোথায়? সময় বদলে যাচ্ছে আর বদলে যাচ্ছে খুব দ্রুত।

ভোট সমীক্ষার নিরিখে বিজেপি :

সাম্প্রতিক এসি নিয়েলসনের নির্বাচনী সমীক্ষার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব থাকলে বলতে হয় ইউ পি এ-র দিন ফুরিয়ে আসছে। পরাজয় হবে নির্ণায়ক। এখন রাস্তায় আন্দোলন নামিয়ে এনে নরেন্দ্র মোদীর পেছনে লেগে বা বাবা রামদেবের সঙ্গে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার মতো প্রতিহিংসা পরায়ণ কৌশল হবে আরও হটকারী। এতে ভোটাররা বাড়তি ক্ষেপে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি-র ভেবে দেখা উচিত লোকসভা স্তব্ধ করে রাখা কি সঠিক পদক্ষেপ? দেশ এক সন্ধিক্ষণের দরজায়, বিজেপি-কে বুঝে নিতেই হবে 'লক্ষ্মণরেখা' না পেরিয়ে যায়। দেশের স্বার্থই হবে প্রথম শেষ এবং চিরদিনের। অতীতেও সমস্যাদীর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল দল, আবার সফলভাবে উতরেও গিয়েছিল।

কিন্তু আজকের সংকট অভূতপূর্ব। এই সঙ্কট কিন্তু ঘনিয়ে এসেছে। শাসক ও বিরোধী দু' দলের দিকেই। এখন দেখার, কে কতটা দৃঢ়তা ও কৌশলের সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে পারে। আজ মনে হয়, অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর মতো একজন রাষ্ট্রনায়ক যদি এগিয়ে এসে মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে পরিত্রাণের পথ বাতলে দিতেন!

তথ্যগতভাবে একথা ঠিকই যে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার নির্মাণের স্থপতির নাম অবশ্যই সোনিয়া গান্ধী। কিন্তু বাস্তবে তো এটি জোট সরকার। তাই প্রধানমন্ত্রীকেই তো অন্যান্য জোট শরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামত নিতে হবে। না হলে তাঁর আর প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এইভাবে খাতায় কলমে সাংবিধানিক ক্ষমতা আর অধিকারহীন ক্ষমতার খেলা তো আমরা ২০০৪-২০১২ অবধি দেখে চলেছি।

অসম : মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরাই এখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক

তারক সাহা

লোকটির নাম বদরুদ্দিন আজমল। পেশায় আতর ব্যবসায়ী, ধনী বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। অসমের রাজনীতির আকাশে গণগণে উজ্জ্বল নক্ষত্র। বলা যায় রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রক। নওগাঁ জেলার হোজাইতে তাঁর ভিটে। সেখানকার মানুষজন বলে থাকে বদরুদ্দিন আজমল অসমের মুসলমান রক্ষাকর্তা। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এ আই ইউ ডি এফ)-এর সর্বময় কর্তা আগামী দিনে রাজ্যের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী। অনেকেই আবার এই আজমলকে মধ্য জুলাইয়ে কোকরাঝাড়ে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নাটেরগুরু বলে দুষছে। আসু-র নেতৃত্ব বলছে এই আজমল হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে সংগঠিত দাঙ্গার পিছনে রয়েছেন। এই দাঙ্গার কারণ হলো তিনি রাজ্যে মুসলমান- স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন।

নিন্দুকেরা যাই বলুক, তাঁর সমর্থকরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁদের মতে বদরুদ্দিনের উত্থানে ভীত রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল। সমর্থকদের বলার পিছনে কারণও রয়েছে। বদরুদ্দিন যে দলের মাথা অর্থাৎ এ আই ইউ ডি এফ দলটি রাজ্যে নগণ্য নয়। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছে বদরুদ্দিনের দলটি। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরেই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল। ৭৪টি আসনে লড়ে বদরুদ্দিনের দল একাই পেয়েছে ১৮ টি আসন, আর কংগ্রেস ৭৮টি আসন। কংগ্রেসের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলা দলটি মুসলিম স্বার্থের রক্ষাকারী। অথচ যে কংগ্রেস রাজ্যের মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক এখন তার প্রতি আর আস্থা নেই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের। রাজনীতির দরিয়ায় ভিড়ে থাকা নতুন তরণীতে সওয়ার এই মুসলমানরা। এই সংকেত দিচ্ছেন খোদ সরকারি বদন্যতায় পোষিত গোয়েন্দাব্যুরোর কর্তারা। এঁদেরই একজন প্রাক্তন কর্তা রবীন্দ্রনারায়ণ রবি যিনি রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাবরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁর

বদরুদ্দিন আজমল

ব্যাখ্যায় আজমলের প্রতি মুসলমানদের অগাধ আস্থা আর তাতেই অসমের গগনে কালো মেঘের উদয় দেখছেন তরুণ গগৈরা।

ওয়াকিবহাল সূত্রের বক্তব্য, রাজ্যের রাজনৈতিক গতিবিধি যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে ২০৩০ সালের মধ্যে আজমলরা অসমের ভাগ্যনিয়ন্তা হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। এমনটা বলছেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ননীগোপাল মোহান্তি। ইনি গুয়াহাটির এক সেফোলাজিস্ট। তাঁর মতে গত নির্বাচনে রাজ্যের মোট ১.৮ কোটি নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে ৫৬ লক্ষই হলো বদরুদ্দিনের 'সহধর্মী'। তাঁর মতে রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে এ আই ইউ ডি এফের শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে সমান্তরালভাবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজ্যের বাইরে আজমলের তেমন পরিচিতি ছিল না। ধনাঢ্য আতর ব্যবসায়ী, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী তাঁর ব্যবসায়ের সীমানা পেরিয়ে রাজ্যের কর্ণধার হবার খোয়াবে মশগুল। তাঁর সমর্থকদের দাবি লোকটি একজন মানবদরদী। তাঁরই বদান্যতায় রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটছে। অনেক স্কুল, হাসপাতাল নাকি তাঁরই তৈরি। এমন ধার্মিক, মানবদরদী ব্যক্তিকে নিন্দুকরা বেবাক সাম্প্রদায়িক বলে কুৎসা রটানোয় তারা বিস্মিত। এদের দাবি, এই বছরে রাজ্য যখন বন্যায় প্লাবিত তখন আজমলের অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে পড়ে জনসেবায়। তিনিই রাজ্যজুড়ে পরিত্রাণের মসিহারূপে ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে ত্রাণ বিলিয়েছেন।

বদরুদ্দিনের ভাগ্যের চারাগাছটি রোপণ করে গেছেন তাঁর বাবা আজমল আলি। আলি হোজাইয়ের চাষী। এই পরিবার সদলবলে পাঁচের দশকে পাড়ি দেয় মুম্বাই। তারপর আর পিছনে ফিরতে হয়নি। আশির দশকে বদরুদ্দিনদের আতর ব্যবসা জমে ওঠে আরবসাগরের পশ্চিমতীর দুবাইয়ে। বদরুদ্দিনের রমরমা কেবল ব্যবসায় নয়, তাঁর ব্যস্ত সময়ের অনেকটাই কাটে রাজ্যের চৌহদ্দির বাইরে।

রাজ্যের রাজনীতির মূলস্রোতে আজমলের জয়যাত্রা শুরু ২০০৫-এ। ১৩টি 'পিছড়ে বর্গে'র সংগঠন আজমলের দল গঠনে মদত জোগায়। মাত্র ছ' মাসের শিশু দলটি কিন্তু অচিরেই সাবালক হয়ে যায়। ২০০৬ সালের বিধানসভায় দলটি পাঠায় তাদের ১১ জন সদস্যকে। ১২৬টি সদস্যের বিধানসভায় ৭১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১১ জনকে জিতিয়ে আনে শৈশবে থাকা দলটি। যেসব অঞ্চল থেকে এই ১১ জন জিতে এসেছে সেই অঞ্চলগুলিতে সবই মুসলিম প্রধান অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলি হলো ধুবড়ি, বরপেটা, হোজাই, ধিঙ, বিলাসীপাড়া (পশ্চিম), যমুনামুখ প্রভৃতি।

বদরুদ্দিন মিঞার দল ২০০৮ সালের পঞ্চায়েতে ভাল ফল করেছিল। ভোটের

শতকরা হার প্রায় ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৩ শতাংশে পৌঁছেছিল। এই বৃদ্ধির হার কেবল দুই বৎসরে, ২০০৯ সালে দলটি নিজস্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে বদরুদ্দিনের প্রচেষ্টায়। ধুবড়ি থেকে বদরুদ্দিন লোকসভা নির্বাচনে রেকর্ড ব্যবধান ৩ লাখ ভোটে জেতেন। তাঁর ভোট শেয়ার ১৬ শতাংশ। ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৯টি আসনেই প্রার্থী দেয় বদরুদ্দিনের দল।

কংগ্রেস এতদিন মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল ভোট ব্যাঙ্ক বাড়াবার লক্ষ্যে। কিন্তু ফল হচ্ছে উল্টো। বিষবৃক্ষের ফল যে বিষ-ই হয় এতদিনে তা টের পাচ্ছে নিন্দুকেরা। তারা সখেদে আজ বলছে যে, বদরুদ্দিনের দল শরীরের মেদ বাড়িয়েছে কেবল মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নির্ভর করে। একথা বলছেন খোদ অসম কংগ্রেসের প্রবক্তা পঙ্কজ বোরা। অথচ এদেরই বদান্যতায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে সারাদেশের সঙ্গে অসমেও ভয়াবহরূপে বেড়ে যাচ্ছে মুসলিম জনসংখ্যা। আর এরই ফলে রমরমা বাজার বদরুদ্দিনের।

এক এ আই ইউ ডি এফের নেতা পরিহাসের ছলে বলেছেন যে, তাঁর দলের বাড়-বাড়ন্তে রাজনৈতিক দলগুলির মেরুদণ্ড দিয়ে বরফজল বয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস যেন বালিতে মুখ গুঁজে রয়েছে। তাদের প্রবক্তা প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝেও না বোঝার ভান করে বলছেন যে, বদরুদ্দিন তাঁদের দলের কাছে তেমন বড় প্রতিদ্বন্দ্বী নন। মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে তিনি এইসব বিষয়গুলি তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে বলেছেন যে, ২০০৬ সালে তাদের দল ৫৩টি আসনে জিতেছিল আর ২০১১-তে তা বেড়ে ৭৮টি হয়েছে। তাঁর মতে বাড়তি আসন নাকি রাজ্যে সমস্ত ভোটারদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার ইঙ্গিত।

বিদ্রূপের সুরেই এ আই ইউ ডি এফের এক নেতা বলেছেন যে, মুসলিম ভোট হারিয়ে ভোট-ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কংগ্রেস নাকি বোড়োদের দুয়ারে। তাঁর সরাসরি চ্যালেঞ্জ— রাজ্যে ৩২ শতাংশ মুসলিম ভোট আর বোড়োদের মাত্র সাড়ে ছয় শতাংশ। এই ভোট ব্যবধান যা উত্তরোত্তর বাড়ছে তাতে আগামী দিনে কংগ্রেস রাজ্য থেকে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে এমন বার্তা কংগ্রেসকে দিয়ে রেখেছেন ওই নেতা।

রাখঢাক না করেই মুসলমান স্বার্থরক্ষায় যে এ আই ইউ ডি এফ সচেষ্ট এই বার্তা সারা রাজ্যে মুসলিম সমাজ বিশেষত বাংলাদেশীদের দিয়ে চলেছে। সত্যকে ধামাচাপা দিতে দলটি প্রচার চালাচ্ছে যে, ব্রহ্মপুত্র এবং তার শাখা নদীগুলি যেভাবে বিধ্বংসীরূপ নিয়ে দু'কূল ভাঙছে তাতে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বসতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং তারা যে প্রকৃত ভারতীয় তা বোঝাতে তারা প্রচার চালাচ্ছে যে, বন্যার ফলে বাস্তুচ্যুত মুসলিমরা তাদের নাগরিকত্বের সবরকম প্রমাণপত্র হারিয়ে ফেলায় তাদের বাংলাদেশী তকমা দেওয়া হচ্ছে--- এমনই প্রচার চালিয়ে জনমত সংগঠনের নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন বদরুদ্দিনরা। মুসলিম মসিহা সত্ত্বেও এ আই ইউ ডি এফের প্রবক্তা মি. লাংথাসার- এর বক্তব্য, তাঁর দল নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁর দল সর্বধর্মসমন্বয়ে বিশ্বাসী এমনটাই দাবি লাংথাসার। আসাম জ্বলছে জ্বলুক, বদরুদ্দিনের দলের মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে হোক তবুও জাতীয় মূলস্রোতের দলগুলি এখনও বালিতে মুখ গুঁজে রয়েছে। জয় হোক ধর্মনিরপেক্ষতার!

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

সুদর্শনজী

কিছু স্মৃতি

প্রদীপ ঘোষ

সুদর্শনজীর সান্নিধ্যে গেলেই বোঝা যেত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। বাস্তবিকই একজন কার্যকর্তা নিজেকে কীভাবে সব দিক দিয়ে কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলেন তার সত্যিকারের উদাহরণ সুদর্শনজী।

সুদর্শনজীর জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অপরিসীম। জরুরি অবস্থা ওঠার পরে সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় বালাসাহেব দেওরস পশ্চিমবঙ্গের সাতটি প্রধান স্থানে ভ্রমণ করে স্বয়ংসেবকদের শারীরিক প্রদর্শন দেখেন এবং স্বয়ংসেবক ও জনতার সামনে ভাষণ দেন। স্বস্তিকা'র সাংবাদিক হিসেবে আমি তাঁর সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। বর্ধমান থেকে শুরু। বর্ধমান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল সিউড়ি (বীরভূম)। কয়েকটি মোটর গাড়ির বাহিনী। যোগাযোগবশতঃ আমি সুদর্শনজীর গাড়িতে ছিলাম। উনি তখন অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ। বাংলা তখনও জানতেন না। খালি বাংলা বর্ণমালাটা শিখে নিয়েছিলেন। গাড়িতে উনি সেদিনের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় দুটি বানান করে করে পড়তে লাগলেন এবং আমাকে বললেন হিন্দীতে তার অর্থ বুঝিয়ে দিতে। এইভাবে সারা রাস্তা ওঁর ভাষাশিক্ষা চলল। ওইদিন রাত্রে সিউড়ি থেকে ট্রেনে উঠে আমরা পরদিন ভোরে শিলিগুড়ি পৌঁছোলাম এবং ওখানে স্নান জলপান সেরে আবার যাত্রা কুচবিহারের দিকে উত্তরবঙ্গের কার্যক্রমের জন্য। বেশ কয়েক ঘণ্টার যাত্রা। এবারে দেখলাম উনি ইংরাজিতে লেখা একটি সচিত্র বৃহৎ জুজুৎসুর বই বার করে সারা রাস্তা তা পড়তে পড়তে চললেন। উনি শারীরিক প্রমুখ হিসেবে সঙ্ঘে নিযুদ্ধ ও তীরন্দাজী ইত্যাদি প্রচলন করেন। এর আগে সঙ্ঘে খড়গ ও শূল ইত্যাদি ছিল, যার ব্যবহারিক উপযোগিতা তেমন ছিল না, ওঁর সময়ে সেগুলি উঠে যায়। নিযুদ্ধ প্রচলনের জন্য উনি দেশী-বিদেশী অনেক বই পড়েছিলেন। শুনেছি উনি নিযুদ্ধের দেশী কসরৎ শেখার জন্য একটি আশ্রমেও কিছুদিন ছিলেন।

যাইহোক এই ভ্রমণ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। আমরা যখনই কোনও স্থানে পৌঁছেছিলাম তখনই সুদর্শনজী আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন যে মাঠে বিকেলে সমাবেশ হবে সেইখানে। শারীরিক কার্যক্রমের নির্ঘণ্ট আগে থেকে পাঠানো ছিল এবং স্বয়ংসেবকেরা তা অভ্যাস করে রেখেছিলেন। উনি প্রত্যেকটি স্থানে সেই সমবেত কার্যক্রমের কড়া প্র্যাকটিস কয়েক ঘণ্টা ধরে করে রাখছিলেন। যার জন্য বিকেলে প্রকাশ্য সমাবেশে খুব সুচারুভাবে তা সম্পন্ন হতে পেরেছিলেন। পূজনীয় বালাসাহেব এই কার্যক্রমগুলির খুব প্রশংসা করেছিলেন।

ওঁর অধ্যয়ন প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে একবার আমি মধ্যভারত প্রান্তের প্রমুখ স্থান ইন্দোরে গিয়ে দিন সাতেক ছিলাম ওখানকার প্রান্ত কার্যালয়ে। ওই প্রান্তের প্রান্ত সংঘচালক প্রথিতযশা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রামনারায়ণ শাস্ত্রীর কাছে চিকিৎসার জন্যই গিয়েছিলাম। ওই সময়ে সুদর্শনজী ছিলেন মধ্যভারত প্রান্ত প্রচারক এবং অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ। উনি দেখলাম ওই এক সপ্তাহ ধরে ইন্দোরেই ছিলেন, বাইরে কোথাও ভ্রমণ ছিল না। বিকেলে শাখায় যাওয়া ছাড়া বাকি সারাটাদিন দেখতাম উনি বসে বসে কোরাণ পড়ছেন। হ্যাঁ, কোরাণ! আট দশ খানা মোটা মোটা কোরাণের বই ওঁর টেবিলে। আর উনি মুখ গুঁজে পড়ে চলেছেন। বললেন, ''এখন আমি কোরাণ অধ্যয়ন করছি।'' বাস্তবিকই সব ধর্মমত সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে ধর্মের তুলনামূলক বিচার কীভাবে সম্ভব হবে?

মাত্র দুবার ওঁকে রাগতে দেখেছি। যাকে বলে সাত্ত্বিক ক্রোধ। উত্তরবঙ্গের কার্যকর্তাদের সম্মেলন শিলিগুড়িতে। আমরা মালদা থেকে গিয়েছি। সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী ওই বৈঠকের উদ্বোধন করবেন সকালবেলা এবং তারপর দু'দিন বৈঠক চলবে। মাননীয় সুদর্শনজীর আসার অপেক্ষায় আমরা ধর্মশালার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি। স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের আত্মীয়রা ফুল হাতে দু'দিকে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছেন। সুদর্শনজীর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করবেন বলে। সুনদর্শনজী গাড়ি থেকে নেমে এগোতেই একজন প্রবীণ প্রচারক হেঁকে উঠলেন, 'ভারতমাতা কী জয়।' সমস্বরে সেই জয়ধ্বনি উঠতেই সুদর্শনজী তড়াক করে পেছিয়ে গেলেন। বললেন, ''সঙ্ঘের কার্যক্রমে শ্লোগান! আমি ঢুকবো না এখানে।'' এই বলে লাফিয়ে গাড়িতে উঠেই বললেন, 'গাড়ি ঘোরাও।' তাড়াতাড়ি অধিকারীরা গিয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁকে নামিয়ে আনলেন। বাকি কাজটুকু নির্বিঘ্নেই হলো।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও শিলিগুড়িতেই। সরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয় বালাসাহেব দেওরসের উপস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের কার্যকর্তাদের বৈঠক। শেষদিন বিকেলে আমরা গণবেশ পরে পথ সঞ্চলন করে বাঘাযতীন পার্কের দিকে রওনা দিলাম। ওখানে নাগরিক ও স্বয়ংসেবকদের সমাবেশে বালাসাহেবের ভাষণ হবে। এখন ব্যাপার হলো এই যে বাঘাযতীন পার্কের একপাশে বেশ কিছু বাঁশ ডাঁই করে রাখা ছিল। আগের কোনও অনুষ্ঠানে ওইগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। মনোমোহনদা কয়েকদিন ধরে উদ্যোক্তাদের গিয়ে বলছিলেন ওইগুলি সরিয়ে নিতে। তাঁরা কথা দিয়েও তা সরাননি। আমরা যখন মাঠে ঢুকছি তখন দেখা গেল ওই উদ্যোক্তাদের লোকেরা এবং স্বয়ংসেবকেরা মিলে তা সরিয়ে ট্রাকে তুলছেন। অর্ধেক তখনও বাকি। ওই দৃশ্য দেখেই সুদর্শনজী প্রায় দৌড়ে সেদিকে গেলেন এবং তর্জনী তুলে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ''অভীতক হটায়া নঁহী। আগ লগা দো।'' এমন দৃশ্য আর কোনওদিন দেখিনি।

অন্য রকম

বাস্তবের 'সিনেমা'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিনেমায় এমনটা আকছার দেখা যায়। কিন্তু শুভঙ্কর বিশ্বাসের পক্ষে সেইসব সিনেমা দেখা সম্ভব নয়। প্রথমত, তার বয়সটা একটা ফ্যাক্টর। শুভঙ্করের বয়স মাত্র ৭। এই বয়সে টিভি দেখাটা এখন আর যদিও অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তা হৃদয়ঙ্গম করাটা কঠিন। দ্বিতীয়ত, বর্ধমানে রেললাইনের ধারের ঝুপড়িতে সাতজনে মিলে গাদাগাদি করে থাকা একটা পরিবারের কাছে টিভিটা একটা বিলাসিতা বই তো আর কিছু নয়। আর তেমন পরিবারেই শুভঙ্করের জন্ম। গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর। শুভঙ্কর তখন আরও ছোট। দশটায় তার স্কুল অর্থাৎ সাহাপুর কল্যাণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছুটির পর একা একা রেললাইন ধরে বাড়ি ফিরছিল সে। তার বাবা সুধাময়ের ওইদিন ছুটি ছিল। বাড়িতেই রান্না-বান্নার কাজে স্ত্রী-কে সাহায্য করছিলেন তিনি। বাড়ি ফেরার পথে আচমকাই রেললাইনে চোখ আটকে গেল ছোট্ট শুভঙ্করের। ছ'টা ক্লিপের মাধ্যমে তিনটে স্লিপারকে জুড়ে থাকতেই এতদিন দেখেছে সে। কিন্তু এখন দেখল ওগুলো ভেঙে যত্র-তত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিপদ কতটা ভয়াবহ হতে পারে সেটা বোঝার সামর্থ্য না থাকলেও, গড়বড় যে একটা কিছু হয়েছে সেটা বুঝতে দেরি হয়নি শুভঙ্করের। বিশ্বাস করুন, তার কাছে ডিরেক্টরের স্ক্রিপ্ট ছিল না; ছিল না লাইট, ক্যামেরা সাউন্ডও, কিন্তু এরপর বাস্তবে যা ঘটল, সিনেমার দৃশ্যে তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত আমরা। একছুটে বাড়ি এসে, মা-কে ডেকে সবকিছু জানায় সে। হোক সে আত্মজ, একটা শিশু কি না কি দেখে এসে চেঁচাচ্ছে, বিষয়টা একটু ভালভাবে বুঝে নিতে চাইছিলেন সুধাময়। কিন্তু ততক্ষণে দূরে রেলের কু-ঝিক ঝিক আওয়াজ দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে। অপার বিস্ময়ে সুধাময় দেখলেন, তাঁর স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে রেললাইন ধরে, আর কিছু না পেয়ে আলমারি থেকে একটা লাল শাড়ি বের করে, তাই নাড়তে নাড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে রেলগাড়ির চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েই

কলকাতার হোটেলে শুভঙ্কর বিশ্বাসের সংবর্ধনা।

দাঁড়িয়েছিলেন সুধাময়বাবু। ঘোর কাটলে দেখলেন ট্রেনটি থমকে গেছে। যার নিটফল রেললাইন বিচ্যুতি হওয়া থেকে ট্রেনটির বেঁচে যাওয়া ও সহস্রাধিক মানুষের জীবন-প্রাপ্তি।

এহেন একটি ঘটনা 'ইতিহাস' হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল। বর্ধমান জেলা পুলিশ তার জন্য একটি ছোট সংবর্ধনার ব্যবস্থা করেছিল। সেই সংবর্ধনায় এসেছিলেন সিনেমার হিরো প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বাস্তবের ছোট্ট হিরোটিকে কাঁধে তুলে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি তিনি। ২৫,০০০ টাকার চেক এবং দু-চাকার একটা সাইকেল শুভঙ্করের হাতে তুলে দেন তিনিই। ব্যস ওই পর্যন্তই। বর্ধমানের পূর্ব সাহাপুর রেল কলোনীতে বাবা-মা, দাদু-দিদা, দুই সহদোরের সঙ্গে একটা একচিলতে ঝুপড়িতে থাকে শুভঙ্কর। স্থানীয় পড়শিদের কাছে সে যতই 'হিরো' হোক, দুবেলা দুমুঠো জোটাতে বাবাকে যে রক্তজল করা পরিশ্রম করতে হয় তা বেশ বোঝে সে। সম্প্রতি কলকাতার একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরজায় পৌঁছে গিয়েছেন শুভঙ্করের বাবা সুধাময় বিশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন তাঁর নামে একটি বাড়ি দেবেন এবং স্থানীয় পূর্ব সাতগাছি বয়েজ হোমে তাঁর দুই ছেলের নিখরচায় পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করে দেবেন বলে।

সম্প্রতি কলকাতার একটি নামজাদা হোটেলে তার সংবর্ধনাও হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসেরও তবে পুনরুত্থান হয়?

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রমুখ সঞ্চালিকা হলেন শান্তা আক্কা

সংবাদদাতা।। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী ও প্রতিনিধি মণ্ডলের 'প্রথম অর্ধবার্ষিক বৈঠক ২০১২' অনুষ্ঠিত হলো সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নাগপুরের দেবী অহল্যামন্দিরে। বৈঠকে সারাদেশ থেকে ২৫০ জন প্রতিনিধিসহ অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে সাতজন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন প্রান্ত সঞ্চালিকা মুক্তিপ্রদা সরকার, প্রান্তকার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী, সহকার্যবাহিকা মৌসুমী কর্মকার, উত্তরবঙ্গ বিভাগ কার্যবাহিকা কৃষ্ণা বিশ্বাস ও সহ বিভাগ কার্যবাহিকা রুবী দাস এবং উত্তরবঙ্গ বিভাগ প্রচারিকা জয়া ভট্টাচার্য ও দক্ষিণবঙ্গ বিভাগ প্রচারিকা ডালিয়া পুরকাইত। বৈঠকে সমিতির নিজস্ব কর্মপন্থা অনুসারে বার্ষিক কর্মযোজনা স্থির করার পাশাপাশি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং সেগুলি সমাধানের প্রয়াসে সর্বসম্মতিক্রমে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষত অসমের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু তথা বোরো জনজাতির নিধন ও তাদের উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, যাতে অসমে আশু শান্তি ফিরিয়ে আনা ও অসমিয়াদের সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানানো হয়।

শান্তা আক্কা

বৈঠকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো সমিতির অখিল ভারতীয় প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া প্রমীলা তাঈজী মেঢ়ে, যিনি বিগত কয়েকবছর ধরে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে সংগঠনের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁর এই গুরুদায়িত্ব প্রমুখ কার্যবাহিকা শান্তা আক্কাকে অর্পণ করেন। এবং প্রমুখ কার্যবাহিকার দায়িত্ব অর্পণ করেন সীতা আম্মাকে। দায়িত্ব অর্পণের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন প্রমুখ সঞ্চালিকা বন্দনীয়া উষা তাঈজী চাটী। তিনি শান্তা আক্কাজী এবং সীতা আম্মাকে বরণ করে নেন। বন্দনীয়া প্রমীলা তাঈজী উভয়কে শুভেচ্ছা ও আশীর্বচন প্রদান করেন।

শান্তা আক্কাজী হলেন বন্দনীয়া পঞ্চম প্রমুখ সঞ্চালিকা। পুরো নাম ভি. শান্তাকুমারী। সমিতির সেবিকাদের কাছে তিনি শান্তা আক্কা নামেই পরিচিত। ১৯৫২ সালে ব্যাঙ্গালোরে জন্ম। সঙ্ঘ-পরিবারের আবহে বড় হয়ে ওঠা। সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কার্যকর্তা পিতার ৩ মাসের কারাবাস হয়। গান্ধীজীর আহ্বানে মা তাঁর সম্পূর্ণ ঝুলি উজাড় করে দান করেন। বড় ভাই ভি. নাগরাজ বর্তমানে ক্ষেত্রীয় বৌদ্ধিকপ্রমুখ। ছোটভাই ভি. মঞ্জুনাথ কর্ণাটক প্রান্তের প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ। ১৯৭০ সালে শান্তা আক্কা সমিতির কাজে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর এম. এড করেন এবং ভারতীয় বিদ্যাভবন জুনিয়র কলেজে গণিতের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত শিশুশিক্ষা বিষয়ক বিভাগে কর্মরত থেকে তারপর স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন এবং পূর্ণকালীন প্রচারিকা রূপে সমিতির কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্গালোর মহানগর কার্যবাহিকা, বিভাগ কার্যবাহিকা এবং দক্ষিণ কর্ণাটক প্রান্ত কার্যবাহিকার দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৩ সালে অখিল ভারতীয় প্রমুখ কার্যবাহিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর আগস্ট মাস থেকে তিনি পেলেন বন্দনীয়া প্রমুখ সঞ্চালিকার গুরু দায়িত্ব। বর্তমান প্রমুখ কার্যবাহিকা সীতা আম্মাজীর পুরো নাম অন্নদানম্ সীতা। আদি নিবাস অন্ধ্রপ্রদেশ। ছোটবেলা থেকেই তিনি সেবিকা। মাধ্যমিকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সীতা আম্মা গণিত বিষয়ে স্নাতক ও বি. এড. ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে তিনি প্রচারিকা হিসাবে কাজ শুরু করেন। শারীরিক ও বৌদ্ধিক উভয় বিষয়েই দক্ষ সীতাআম্মা সমিতির কাজের বিস্তারে ইংল্যান্ড, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া ও অন্যান্য বহুদেশ ভ্রমণ করেন।

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে মাস্টারমশায়ের জন্মশতবার্ষিকী

সমাবেশ সমাচার

গত ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রায়গঞ্জ সুপার মার্কেটের মার্চেন্ট অফ্ চেম্বারর্সের সভাগৃহে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী (মাস্টারমশায়)-র জন্মশতবর্ষের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য মাস্টারমশায় ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রথম প্রান্ত সঙ্ঘচালক। মাস্টারমশায়ের রচিত একাধিক সঙ্গীত পরিবেশন ও তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক, রাধাগোবিন্দ পোদ্দার ও ঋতা চক্রবর্তী। শ্রীমতী চক্রবর্তী রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত- কার্যবাহিকা তথা মাস্টারমশায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ধন্যবাদ দেন সঙ্ঘের রায়গঞ্জ মহকুমা সঙ্ঘচালক বিজয় তালুকদার। সঙ্ঘের জেলা পদাধিকারী সহ বহু কার্যকর্তা, স্বয়ংসেবক, নাগরিক তথা মাতৃমণ্ডলী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। স্বয়ংসেবকরা মাস্টারমশায়ের জীবনের অনেক উৎসাহপূর্ণ অজানা ঘটনা জানতে পেরে উৎসাহবোধ করেন।

***

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বালুরঘাট নগরে সারদা শিশুমন্দির সভাগৃহে এক মনোজ্ঞ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, শ্রোতাদের মধ্যে যুবক- তরুণদের ছিল সংখ্যাধিক। মাস্টারমশায়ের কর্মময় সংঘজীবনের বিভিন্ন দিক সবার সামনে তুলে ধরেন স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য, প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার ও রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক। বর্তমান প্রজন্ম মাস্টারমশায়ের ব্যক্তিত্ব ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জেনে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করেন। কার্যক্রমের ব্যবস্থাতে ছিলেন প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রদীপ সাহা।

শিশু সংস্কার কেন্দ্রের বার্ষিক কার্যক্রম

সমাজ সেবা ভারতীর পরিচালনায় ঝাড়গ্রাম জেলায় ১৮টি শিশু সংস্কার কেন্দ্র চলে। ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রিক ১২টি শিশু সংস্কার কেন্দ্রের বার্ষিক কার্যক্রম ১৬ সেপ্টেম্বর ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন যুব শিল্পপতি অভিষেক যাদব, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খড়গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক এ কে দত্ত এবং অপর অধ্যাপক ভি. কে. তেওয়ারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম সেবায়তন উচ্চতর বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ক্ষিতীশচন্দ্র খাঁড়া। এছাড়া খড়গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোজকুমার পাত্র উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিটি কেন্দ্রের ৬টি বিষয়— সরস্বতী বন্দনা, ঐক্যমন্ত্র, গীত, সুভাষিত, গায়ত্রীমন্ত্রের জন্য ১ জন করে নির্বাচিত করে আনার জন্য বলা হয়েছিল। ১২টি কেন্দ্রের মোট ৫০ জন ভাই বোন অংশগ্রহণ করেছিল। দাদাভাই দিদিভাই ও অভিভাবক মিলে ৬০ জন, মোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

কার্যক্রমের মূল আকর্ষণ ছিল সাজো প্রতিযোগিতা। ভারতমাতা, বিবেকানন্দ, কৃষ্ণের সাজে সজ্জিত হয়ে যথাক্রমে ভারতমাতা স্তোত্রম, স্বদেশমন্ত্র, গীতার শ্লোক সাবলীল ভাবে উচ্চারণ যা অতিথিবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে। যোগাসন প্রদর্শন ও বিশেষ প্রতিভা বিকাশের কার্যক্রম হয়েছে। গীতিনৃত্য ও দিদিভাইদের শঙ্খবাদন প্রতিযোগিতা কার্যক্রমকে আনন্দমুখরিত করেছে।

ক্ষিতীশ চন্দ্র খাঁড়া শিশু সংস্কারের উপরে বক্তব্য রাখেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ, সদাচার, নৈতিকতা বোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিশু সংস্কার কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পিছিয়ে পড়া শিশু ভাই বোনেদের বিকাশ অত্যন্ত আবশ্যিক বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সংস্কার কেন্দ্র প্রত্যেক গ্রামে হওয়া উচিত। অধ্যাপক ভি. কে. তেওয়ারির সমস্ত শিশু ভাই বোন ও দাদাভাই দিদিভাইদের পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

রাজ্যজুড়ে কিষাণ দিবস পালন

গত ২১ সেপ্টেম্বর ভাদ্রপদ শুক্লা ষষ্ঠীতে কিষাণ দেবতা 'বলরামের জন্মতিথি উপলক্ষে 'কিষাণ দিবস' পালন করা হয়েছে। সারা রাজ্যে ৭০টিরও বেশি স্থানে কিষাণ দিবস পালন করা হয়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুর্শিদাবাদ জেলার 'কল্যাণপুর' গ্রামের স্বদেশ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৩০০ জনের অধিক কৃষকদের সামনে কিষাণ দিবসের গুরুত্ব ও তার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক নন্দলাল কাঠ।

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর-২ কালিকাতলা বাজারে, যেখানে সবজি লাভজনক মূল্যের দাবিতে পথ অবরোধ করে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন জেলাসভাপতি শচীন রায়। তাঁরই উদ্যোগে বিরাট কিষাণ দিবস পালন করা হলো প্রায় ২০০০ হাজার কৃষকদের উপস্থিতিতে। বক্তব্য রাখেন সহসংগঠন সম্পাদক অমল ঘোষ। কালনা একচাকা গ্রামে কিষাণ দিবসে প্রভাত মণ্ডল বলেন, আগামীতে কিষাণদের করণীয় কী এবং সংগঠনের মাধ্যমেই তা করা একমাত্র সঠিক পথ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বীরভূম জেলার কালিকাপুর গ্রামে 'বলরাম' পুজো উপলক্ষে প্রায় ২০০ কৃষকদের উপস্থিতিতে 'বলরামকে' কিষাণের দেবতা কেন বলা হয় এবং তাঁর জীবনচরিত নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কল্যাণ মণ্ডল। দক্ষিণ দিনাজপুরের সুতইল গ্রামে কিষাণ দিবস উপলক্ষে সারাদিন কিষাণমেলা হয়। বালকদের বলরাম সাজো প্রতিযোগিতা ও গ্রামের দেশী দুগ্ধবতী গাই-এর 'দুধ দহন' প্রতিযোগিতা হয়। প্রায় ২০০০ হাজার কৃষক পরিবারসহ প্রসাদ গ্রহণ করেন। জেলা সম্পাদক অধীর দাস প্রতিযোগীদের বলরামে ছবি পুরস্কার হিসাবে তুলে দেন।

উত্তরদিনাজপুর জেলায় মহেশপুর ও উত্তর লক্ষ্মীপুর গ্রামে বলরামের পূজা করা হয়। শিলিগুড়ির হাতিঘিসা গ্রামে কিষাণ দিবস উপলক্ষে সারারাত বাউল গানের আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলার রামকৃষ্ণপল্লী, পশ্চিমমাগুরমারি গ্রামে ও কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের সালবারি এবং মাথাভাঙ্গার কুর্শামারিতে কিষাণ দিবস পালন হয়।

দার্জিলিং জেলার কালিম্পং-এর ডুংরবস্তির হলঘরে কিষাণ দিবস উপলক্ষে 'গোমাতা পূজা' করা হয়। জৈবিক চাষের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কিষাণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাজ্য জৈবিক প্রমুখ ভানু থাপা। জেলা সম্মেলনে ওইদিনে কালিম্পং ব্লক সমিতি গঠন করা হয় এবং জেলা সমিতির পুনর্গঠন করা হয়।

বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের সাধারণ সভা

দুর্গাপুর নগরের সেবা সংস্থা, সমাজ সেবাভারতীর অনুমোদিত বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৯ আগস্ট দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪৫ জন সদস্যর উপস্থিতিতে নূতন সমিতি নির্বাচন এবং সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে বর্তমান সেবা প্রকল্পের বিবরণ রাখা হয়। মোট ১৬টি প্রকল্পে ১৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ২৫ জন সেবা কার্যকর্তা নিয়মিত ভাবে সেবা কাজের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত তিনটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ৩৫ জন মহিলা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। চালের পাঁপড় এবং ডালের বড়ি উৎপাদন এবং তা বন্টনের ব্যবস্থার উপর সংস্থার প্রমুখ নীলা মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে এবছর রাখীবন্ধন উৎসবে প্রায় ৪০০০ জনের সঙ্গে নতুন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মাতৃসম্মেলন ইজাপুর পঞ্চায়েত ভবনে প্রায় ২১৫ জনের উপস্থিতিতে পালিত হয়। স্বাধীনতা দিবস ও ঋষি অরবিন্দের জন্মজয়ন্তীতে ১৫ আগস্ট ৪টি গ্রামে ৬ স্থানে উদযাপন করা হয়। বাঙ্গুরী গ্রামে শিশু সংস্কার কেন্দ্রের উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধান শিক্ষক আবেদ আলী মহাশয় পতাকা উত্তোলন করেন।

সমিতির সভাপতি হন দুর্গাপুর ইস্পাত সংস্থার প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ভরতভূষণ। এছাড়াও সাধারণ সম্পাদক— মলয় কালী, কোষাধ্যক্ষ— শুভাশিস মাজী। উপস্থিত ছিলেন আর এস এস-এর প্রান্ত সেবাপ্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায়।

লাইফ ইন্স্যুরেন্স এজেন্টস সভা

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনুমোদিত ভারতীয় লাইফ্ ইন্স্যুরেন্স এজেন্টস্ সঙ্ঘের একটি সাম্প্রতিক বৈঠকে কে এম ডি-২ ডিভিসনাল কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। এই বিষয়টি কে এম ডি-২ বরিষ্ঠ ডিভিসনাল ম্যানেজারকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর '১২-তে পত্রমারফৎ জানানো হয়েছে। ডিভিসনাল সভাপতি ও সম্পাদক হিসাবে যথাক্রমে তপন চন্দ্র কর্মকার ও মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী নির্বাচিত হয়েছেন।

শোকসংবাদ

গত ১৯ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী ভারতী বেজ আরামবাগে নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি চার পুত্র, পুত্রবধূ ও স্বামীকে রেখে গেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আরামবাগ মহকুমা শারীরিক প্রমুখ ও স্বস্তিকা-র প্রচার প্রতিনিধি শিবাশিস বেজ এবং বোলপুর নগর কার্যবাহ দেবাশিস বেজ-এর মাতৃদেবী। তিনি ছিলেন স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের কাছে মাতৃসমা।

ও৩ম্

৯ অক্টোবর ২০১২

চলো ভাই চলো !

ধর্মতলা চলো

দুপুর ২ ঘটিকায়

রাষ্ট্র জাগরণ মহাসম্মেলন

স্থান ঃ রানী রাসমণী রোড, ‘Y’ রোড, ধর্মতলা

ঃঃ নিবেদক ঃঃ

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা, ৪২, শংকর ঘোষ লেন, কোলকাতা-৬

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মণ্ডল—৯৮৭৪৩৯৮৩৩৭/৮৮২০৩২৯৪৬৩

■ গ্যাংটক-নামচি-পেলিং-ইয়ুমথাং ■ দার্জিলিং ■ পুরী ■ সিমলা-কুলু-মানালী ■ কাশ্মীর ■ ভাইজ্যাক-আরাকু ■ দিল্লী-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-হরিদ্বার-মুসৌরী ■ কেরালা ■ গোয়া ■ মুম্বাই ■ আন্দামান ■ শিলং-চেরাপুঞ্জি-গৌহাটি ■ দেওঘর ■ সুন্দরবন

প্যাকেজ ট্যুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

দ্বিতীয়সত্তা প্রযোজিত নাটক ‘বাঘনখ’

দেবাদিত্য চক্রবর্তী॥ দ্বিতীয় সত্তা নাট্যগোষ্ঠী সম্প্রতি মঞ্চস্থ করছে, জয়ন্ত দে-র গল্প অবলম্বনে সুমন সেনগুপ্তের পরিচালনায় নাটক— বাঘনখ।

একটি পরিবার এবং তাদের সমস্যার সঙ্গে উঠে এসেছে বর্তমান সমাজের খণ্ডচিত্র।

অমিতেশ আর পুতুলের একমাত্র মেয়ে রিনি। কিন্তু রিনির স্কুলে যাওয়া তো দূরের কথা, তার বাড়ি থেকে বেরোনো অবধি বন্ধ হয়ে গেছে ফুকো নামক এক পাগলের উৎপাতে। ফুকো রিনিকে দেখলেই বৌ বৌ করে ছুটে আসে। আসলে ফুকোকে ভুল বোঝাচ্ছে, শ্যামল, লাল্টু আর পটলা নামের তিন বখাটে ছেলে। তাদের উদ্দেশ্য ভয় পেয়ে যদি অমিতেশ বাড়ি বেচে দেয় তাহলে সেখানে ফ্ল্যাটবাড়ি তোলা যাবে। এই তিনটি ছেলেকে মদত দেয় তথাকথিত এক সমাজসেবী রাজনীতিক বাদল রায়। অমিতেশ বাধ্য হয়ে তার পরিচিত উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা হেমাঙ্গবাবুর শরণাপন্ন হন। কিন্তু তিনিও রাজনীতির জটিলতায় কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেন। শেষ পর্যন্ত ফুকো যখন বাড়ির ভিতরে এসে হামলা চালায়, তখন অসহায় অমিতেশ আর পুতুল মেয়েকে বাঁচানোর আর কোনও উপায় না দেখে ফুকোকে কীভাবে খুন করা যায় তার পরিকল্পনা করতে থাকেন। অপরদিকে সেদিনই ফুকো গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়। অমিতেশ আর পুতুল নিশ্চিন্ত হলেও ভেঙে পড়ে রিনি। খুনের প্ল্যান করতে দেখা বাবা-মাকে সে আর মেনে নিতে পারে না। তার কাছে ওরা তখন খুনীরই নামান্তর। রিনির মনে হয়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধহয় সুপ্ত অবস্থায় একটা খুনী বাস করে। অনুকুল পরিবেশে সেই খুনীর নখ ‘বাঘনখে’র মতোই ধারালো হয়ে ওঠে।

নাটকে ফুকোর চরিত্রাভিনেতা অসাধারণ অভিনয় করেছেন। রাজনীতিককে সবুজ পাঞ্জাবী পরিয়ে পরিচালক কি বিশেষ কোনও ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন? বিমল সামন্তের মঞ্চ এবং বাবলু সরকারের আলো খুব সুন্দর। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়ের আবহ যথোপযুক্ত। সব মিলিয়ে ‘বাঘনখ’কে মনোরঞ্জনের মোড়কে এক সমাজচিত্র বলা যায়, যেখানে রাজ্যের আইনরক্ষক এবং সমাজরক্ষকদের ভিতরের অনৈতিক আঁতাতের কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের প্রযোজনা ‘তৃতীয় আরেকজন’

দেবাদিত্য চক্রবর্তী॥ স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যের মাঝখানে তৃতীয় কোনও পুরুষ বা নারীর আবির্ভাবে সন্দেহ, দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি এবং পরিশেষে বিচ্ছেদ; এই ঘটনা বর্তমান সমাজে হামেশাই শোনা যায়। প্রায় এরকমই একটি কাহিনীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করছে কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র তাদের ‘তৃতীয় আরেকজন’ নাটকে। নাটকের নামটি শুনেই গল্পটি আঁচ করা যায়। সোমনাথ ও তুলির ছোট্ট সংসার। একদিন সোমনাথের কাছে একটি উড়ো ফোন আসে তার স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে। সোমনাথ প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু বাড়িতে এসে একটি অপরিচিত কালো কোট পড়ে থাকতে দেখে তার মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং সেই সন্দেহ এক মানসিক বিকৃতিতে পরিণত হয়। সোমনাথ ক্রমাগত তুলিকে মানসিক নির্যাতন করতে থাকে। তখন তুলির সংলাপে জানা যায়, সোমনাথ চিরকাল তার ওপর কর্তৃত্ব ফলিয়ে এসেছে, কিন্তু তুলির ছোট ছোট ভালোলাগাগুলিকে পাত্তা দেয়নি। তুলির গান গাওয়া, নাচ এমনকি চাকরি করতে চাওয়াটাকে অবধি সোমনাথ বন্ধ করে দিয়েছে সংসারের দোহাই দিয়ে। তুলি যেন এক সোনার খাঁচায় বন্দী পাখি। তার এই বন্দী জীবনে আলোর ছটা হয়ে এসেছে তার পূর্বপরিচিত সায়ন্তন। সায়ন্তন বরাবর তুলিকে তার কাজে উৎসাহ যোগাত। তুলি অনুভব করতে পারত মেয়ে হলেও সে একজন মানুষ। সোমনাথের অত্যাচার যখন চরমে এই সময় সে জানতে পারে তুলির সেই বন্ধু সায়ন্তন একটা চাকরি জোটাবার জন্য তুলির কাছে আসে সোমনাথকে বলার জন্য। সোমনাথের সুপারিশে সে হয়তো চাকরি পেতে পারে। এর বাইরে তাদের মধ্যে কোনও অবৈধ সম্পর্ক নেই। সোমনাথের ভুল ভাঙে। সে আবার তুলিকে আপন করে নিতে চায়। কিন্তু রুখে দাঁড়ায় তুলি। তার ভিতরকার লুকিয়ে থাকা নারিসত্তা জেগে ওঠে। নিজের অপমানের জবাব দিতে সে সোমনাথকে ছেড়ে চলে যেতে চায়। এরপর কি হবে তাদের ভবিষ্যৎ? এই প্রশ্নটি রেখেই গল্পটিকে নাট্যকার সমীর দাশগুপ্ত তার সংলাপের বুননে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সায়ন্তনকে মঞ্চে কখনওই দেখা যায় না। কিন্তু দুই অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দর্শককে কখনও নাটকটিকে একঘেয়ে লাগতে দেয়নি। মাত্র দুজন মিলে পুরো নাটকটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, নিশ্চয়ই খুবই কৃতিত্বের ব্যাপার। ময়ুখ-মৈনাকের আবহ যথোপযুক্ত। কিশোর সেনগুপ্তের পরিচালনায় সমৃদ্ধ হয়েছে ‘তৃতীয় আরেকজন।’

শব্দরূপ-৬৪৪ মণিদীপা পাল

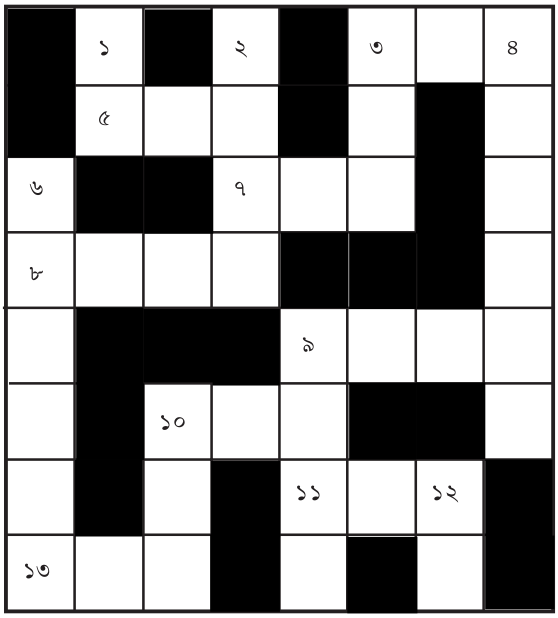

সূত্র :

পাশাপাশি : ৩. তুলসী, রাস্না, ৫. আশা, কামনা, ৭. এই দৈত্য ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়, ৮. যুদ্ধক্ষেত্র, ৯. ন্যগ্রোধ, সুবৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষবিশেষ, ১০. শিব, আগাগোড়া তির, ১১. জলদেবতা বরুণ, বিশেষণে প্রকৃষ্টচিত্ত বা জ্ঞানী, ১২. গঙ্গাদেবীর বাহন।

উপর-নীচ : ১. বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ২. রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রথম দুয়ে অবস্থা, ৩. রাজা উত্থানপাদের দ্বিতীয়া স্ত্রী, শেষ দুয়ে পছন্দ, ৪. কবিরাজি ঔষধে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ, ৬. ফাউন্টেন পেন, ৯. বিশেষণে অভীষ্ট পূর্ণকারী, ১০. ব্যাধ, কিরাত, ১২. দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪১

বৈ	শ	ম্পা	য়	ন			প
	র			র			র্য
	দ্বা			ক	ল	বি	স্ক
বা	ন	র			লি		
		বা			তা	মা	দি
বি	ভা	ব	সু			ষ্টা	
ক			কে			র	
র্ণ			তু	ল	সী	দা	স

সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
দেবস্মিতা পাঠক
শিবপুর, হাওড়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৬৪৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৬ নভেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে স্টল করতে আগ্রহীরা নিম্নলিখিত বইগুলির জন্য যোগাযোগ করুন

হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবাদী বইয়ের বিশাল সংগ্রহ
বইগুলি পড়া একান্ত জরুরী

- স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা ২০ টাকা।
- বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ ৫০ টাকা।
- বিপ্লবী বীর সাভারকর ৩০ টাকা।
- প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ৫০ টাকা।
- নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ (তথাগত রায়) ৮০ টাকা।
- মুসলিম তোষণ ও দেশের সর্বনাশ ১২ টাকা।
- ধর্মনিরপেক্ষতার অন্তরালে ৫০ টাকা।
- ইসলামের স্বরূপ ১২ টাকা।
- দিব্যজ্ঞান নয় কাণ্ডজ্ঞান চাই ৩ টাকা।
- মমতার ইমাম বন্দনা এবং প্রণামী ২৫ টাকা।

আরও অনেক হিন্দুত্ববাদী বইয়ের বিপুল সম্ভার।
আকর্ষণীয় কমিশনে বই নিন।
অবিক্রীত বই অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিলে মূল্য ফেরত।
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
মোবাইল : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে আলোচনাসভা

বিষয় : সন্ত্রাসবাদের উৎস, ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ভারতের ভবিষ্যত

বক্তা : ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, অমিতাভ ঘোষ, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

স্থান : ভারতসভা হল

৬২, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট (বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভিন্যুর ক্রসিং)

তারিখ : ৮ ডিসেম্বর, ২০১২ (দ্বিতীয় শনিবার)
সময় : বিকেল ২-৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭-০০
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

।। চিত্রকথা ।। মহাভারত ।। ১৬

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

জাতীয় পরম্পরার মেলবন্ধন রূপসাগরে অরূপরতন

স্বস্তিকা পুজো সংখ্যা, ১৪১৯

—: উপন্যাস :—

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

—: প্রবন্ধ :—

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়— রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। **তিলকের প্রথম কারাবরণ : শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট** — গুরুপদ শাণ্ডিল্য। **রাষ্ট্রপরিচালনায় ‘খড়ের মানুষের’ উপদ্রব**— প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। **বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ**—তথাগত রায়। **ভারত বনাম ইন্ডিয়া**— অমলেশ মিশ্র। **গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজন**— দেবীপ্রসাদ রায়। **বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানদর্শন ও জাতীয়তাবোধ**— অচিন্ত্য বিশ্বাস। **রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা**— সমিত দে। **আন্দামান দর্শন**— দীনেশ চন্দ্র সিংহ। **রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানবসম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা** — সত্যনারায়ণ মজুমদার। **রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকের শতবর্ষ : দেশে দেশে ডাকঘর**— বিকাশ ভট্টাচার্য। **সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা**— সন্দীপ কুমার দাঁ। **বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা**— অর্ণব নাগ। **মাধেরার সূর্যমন্দির**— সৌমেন নিয়োগী।

—: গল্প :—

রমানাথ রায় ▯ শেখর বসু ▯ গোপালকৃষ্ণ রায় ▯ জিষ্ণু বসু ▯ দীপঙ্কর দাস ▯ রত্না ভট্টাচার্য ▯ গোপাল চক্রবর্তী

—: রম্যরচনা :—

ধামালি— চণ্ডী লাহিড়ী। **ডি লা গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক ইয়াক**— পিনাকপাণি ঘোষ।

—: ভ্রমণ :—

সিন্ধু দর্শনে— বিজয় আঢ্য।

—: দেবীবন্দনা :—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী— ভিক্ষুদেব ভট্ট

সব মিলিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে ভাগ করে পড়ার মতো একটি সংরক্ষণযোগ্য পুজো সংখ্যা

সত্বর কপি বুক করুন।

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে। দাম : ৬০ টাকা।